বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 563. July, 1910.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৬৩ সংখ্যা। | আষাঢ়, ১৩১৭। জুলাই, ১৯১০। | ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের ব্যবস্থার সংস্থাপন—আমাদিগের দেশের প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ শবকে দাহ করিতেই উপদেশ দিয়াছেন। বহুদিন পর্য্যন্ত ইহার উপকারিতা অনেকে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পৃথিবীর নানা স্থানে নানা প্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রথা প্রচলিত আছে কোথাও শবকে প্রোথিত করা হয় (গোর দেওয়া), কোথাও বা (পারসো) জন্তুগণের ভোজনার্থ শ্মশানঃ পর্ব্বতাদি স্থানে ইহাকে নিক্ষেপ করা হয়, কোথাও বা (মিশরে) শবকে, ঔষধ মাখাইয়া শুষ্ককরণানন্তর, কোনও স্থানে স্থাপন করা হয়, এবং কোথাও বা শবকে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, এই সকল প্রথার অনুপকারিতা ততই বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হইতেছে, এবং সেই প্রাচীন-আর্য্যগণ-নির্দ্দিষ্ট শবদাহন-প্রথার যে কত উপকারিতা তাহা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। (সম্প্রতি চৈত্র মাসের সাহিত্যসংহিতায় শবদাহনের উপকারিতা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।) অধুনা সর্ব্বত্র এই প্রথার সংস্থাপনের জন্য চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ককের মৃতদেহ জর্ম্মণীর অন্তর্গত বেনে সহরে চিতানলে ভস্মীভূত করা হইয়াছে।

নারীগণের অধিকার লাভের চেষ্টা।—ইংলণ্ডের সুশিক্ষিতা মহিলারা পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকার লাভের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন। ১০০০০ দশ সহস্র রমণী দলবদ্ধ হইয়া লণ্ডন সহরের রাজপথে বহির্গত হইয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রী এস্কুইথ মহিলাগণকে রাজনৈতিক অধিকারদানে অনিচ্ছুক, কিন্তু মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সভ্যের মতে, নারীদিগকে রাজ-

নৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা অনুচিত।

নবাবিষ্কৃত কৃষিপ্রণালী—ভারতের কৃষি বৃষ্টির উপরেই নির্ভর করে। যে বৎসর বৃষ্টি না হয়, সে বৎসর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। আমেরিকার কৃষিবিজ্ঞানবিদ্ ব্যক্তিগণ বিনা সলিলসেচনে শস্য-উৎপাদন-প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন। এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট শুষ্কভূমিতে শস্য উৎপাদন করিয়াছেন, এবং ক্রমে যে তথায় কৃষির আরও অধিক উন্নতি হইবে, তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষিকংগ্রেশের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বোথাও বলিয়াছেন।

বিনা জলে শুষ্ক মরুভূমিতে কি প্রকারে শস্য জন্মান যায়, ইহা জানিতে পারিলে মানবজাতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় পরীক্ষা দ্বারা দেখা হইয়াছে যে, যদি লাঙ্গল বা কোদালি দ্বারা ভূমি অতি গভীরভাবে কর্ষণ করা হয়, এবং মৃত্তিকা অতি সূক্ষ্মরূপে গুঁড়া করা হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকার নিম্নস্থ রস ঊর্দ্ধে উঠিয়া উপরের মৃত্তিকাকে রসযুক্ত করে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে বিনা জলেই তাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়, এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কোনও প্রকার সার দিবার প্রয়োজন হয় না। মিঃ ম্যাকনারেল নামক এক ব্যক্তি কলের লাঙ্গল দ্বারা মরুভূমি গভীররূপে কর্ষণ করিয়া গত বৎসর ১৫০০০০ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মণ শস্য উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার এক ফোঁটাও জলের প্রয়োজন হয় নাই। (সঞ্জীবনী হইতে গৃহীত।)

আমাদের দেশে এইরূপ কৃষি-প্রণালীর অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

দান—(১) স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে পাতিয়ালার মহারাজ, ফিরোজপুরস্থিত শিখ-কন্যা-মহাবিদ্যালয় ফণ্ডে ১০,০০০ দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন, এবং এই বিদ্যালয়ে মাসিক ৬০০ ছয় শত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

(২) বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ধনকুবের শ্রীযুক্ত স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারনির্ম্মাণার্থে তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এইরূপ দান অতীব প্রশংসনীয়।

বাণিজ্য-সচিব—বিলাতের তারের সংবাদে প্রকাশ যে, মিষ্টার ক্লার্ক ভারতের বাণিজ্য-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। শুনিতেছি মিষ্টার ক্লার্ক একজন অভিজ্ঞ ও উদারনৈতিক।

মৃত্যু—জর্ম্মণীর সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা ডাক্তার গেন অষ্টনবই বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি নেপ্‌চুন গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীজাতির সম্মান।

প্রাণিহিতৈষী মঙ্গলময় বিধাতার মহদভিপ্রায় সাধনার্থেই স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয় জাতি সৃষ্ট হইয়াছে। পুরুষ সকল স্ত্রীগণকে অবজ্ঞা করুক, অবিশ্বাস করুক, অসম্মান করুক, ইহা যে শাস্ত্রসঙ্গত নহে, তাহা আর্য্যগণ উত্তমরূপে বুঝিতেন এবং তাহা বুঝিতে পারিয়াই স্ত্রীজাতির প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাহা শাস্ত্রে উত্তমরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুরাকালে স্ত্রীসম্মানপ্রভাবে প্রতি গৃহে গৃহলক্ষ্মী বিরাজিতা ছিল। সুতরাং প্রত্যেক গৃহস্থভবনই সুখের নিলয়, শান্তিদেবীর প্রিয় বাসস্থান ও পবিত্রতা-দেবীর লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছিল।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্রপূতা ও আসামান্য বুদ্ধি দ্বারা স্থির করিয়া গিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতিতে শৌচ আছে, পবিত্রতা আছে, মধুরভাষিতা আছে এবং আরও অনেক গুণ আছে। এই সকল গুণ আছে বলিয়াই তাঁহারা সম্মানার্হা।

সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বশ্চ শুভাং গিরং।
পাবকঃ সর্ব্বপূতত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতোহ্যতঃ॥
গরুড়পুরাণম্॥

অনুবাদ। সোম (চন্দ্র) স্ত্রীলোকদিগকে শৌচ, গন্ধর্ব্বগণ তাহাদিগকে শুভা বাণী (উত্তম বাক্য বা মধুরভাষিতা) এবং পাবক (অগ্নি) তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার পবিত্রতা দান করিয়াছেন। অতএব যোষিদ্গণ অবশ্যপূজ্য।

মহামতি চাণক্য বলিয়াছেন, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বুদ্ধি চতুর্গুণ, এবং ব্যবসায় বা কর্ম্মোদ্যোগও ছয় গুণ। সুতরাং যাঁহাদের বুদ্ধি পুরুষ অপেক্ষা অধিক, যাঁহাদের ব্যবসায় পুরুষ অপেক্ষা অধিক, তাঁহারা কেনই বা পুরুষ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত না হইবেন?

মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে উক্ত আছে—"সমস্ত জগতে দুর্গাদেবী স্ত্রীস্বরূপে অবস্থিতা আছেন" অর্থাৎ স্ত্রীজাতিই সে জগদম্বারই বিকাশবিশেষ মাত্র। "যে দেবী মাতৃরূপে জগতের স্ত্রীজাতিতে অধিষ্ঠিতা থাকিয়া পুত্রস্নেহ করেন।" ইত্যাদি। অতএব স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও যা, উমাদেবীর প্রীত্যর্থে কার্য্য করাও একরূপ তাহাই। প্রাচীন সংহিতাকারগণও বলিয়াছেন,—যে গৃহে স্ত্রীলোক পূজিত হয়, তথায় দেবগণ প্রীত হইয়া বাস করেন, অর্থাৎ সেই ভবনের সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ সাধিত হয়। আবার যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষা হয় না, সেখানে কোন প্রকারেই মঙ্গল নাই; এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মানরক্ষার্থে যথেষ্ট অনুশাসন করিয়া গিয়াছেন,—
"পদে পদে শুভং তস্য যঃ স্ত্রীমানঞ্চ রক্ষতি।

অবমন্য স্ত্রিয়ং মূঢ়ো যো যাতি পুরুষাধমঃ।
পদে পদে তদশুভং করোতি পার্ব্বতী সতী॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্॥

অনুবাদ। যিনি স্ত্রীজাতির সম্মান রক্ষা করেন, তাঁহার পদে পদে শুভ হয়। যে পুরুষাধম স্ত্রীকে অবজ্ঞা করিয়া যায়, সতী পার্ব্বতী দেবী পদে পদে তাঁহার অমঙ্গল করেন।

যেমন আমরা আমাদের বাড়ীতে পূজা করিবার জন্য চণ্ডীমণ্ডপ বা দেবগৃহ রাখি, তেমনি দেবীতুল্যা সম্মানার্হা স্ত্রীজাতির পূজা বা সম্মান করিবার জন্য অন্তঃপুর নামক পবিত্র স্থান রাখিয়া থাকি। যেখানে মাতার নিকট অলৌকিক স্নেহ, পত্নীর নিকট অকৃত্রিম প্রেম, কন্যার নিকট প্রগাঢ় ভক্তি, এবং অন্যান্য আত্মীয় মহিলাদিগের নিকট যথাসম্ভব স্নেহ ভক্তি ও পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়; যেখানে পীড়ার সময় শুশ্রূষা ও ক্লান্তির সময় বিশ্রাম ও সকল অবস্থাতেই বিনোদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই অন্তঃপুর নামক স্থান কেনই বা না পবিত্র হইবে? এরূপ পবিত্র স্থান পর্য্যবেক্ষণের ভার কি যাহার তাহার উপর দেওয়া যায়? তাই আমাদের প্রাচীন সংহিতাকার মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন—বৃদ্ধ পিতাকে অন্তঃপুর রক্ষার ভার দিবে। পুরাকালে ভূপতিদিগের অন্তঃপুরের নাম শুদ্ধান্ত ছিল।

"শুদ্ধাঃ কামোপরতরক্ষকা অন্তেঽস্য"

যাহার প্রান্তভাগ সংযতেন্দ্রিয় ও শুদ্ধচরিত্র কর্তৃপক্ষ দ্বারা রক্ষিত হয়, তাহাকে শুদ্ধান্ত কহে। যেমন স্থাপিত বিগ্রহের বা দেবদেবীর পূজালয় পর্য্যবেক্ষণের ভার শুদ্ধচরিত্র ও গুণবান্ ব্রাহ্মণবিশেষের প্রতি অর্পিত থাকিত, তেমনি নৃপতিদিগের অন্তঃপুররক্ষার ভারও শুদ্ধচরিত্র ও গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগের হস্তে ছিল। স্ত্রীরূপিণী দেবীর সেবার জন্যই পিতা প্রভৃতি আত্মীয় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছেন। যেমন বিগ্রহ বা দেবদেবীর সেবক কখন কখন পরিবর্ত্তিত হয়, তেমনি পূজার্হা স্ত্রীজাতিরও সেবক কখন কখন পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই পরিবর্ত্তন বিষয়ে শাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম আছে;—

"রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বাল্যে যৌবনে পতিরেব তাম্।
বার্দ্ধকে রক্ষেত পুত্রো হ্যনাথা জ্ঞাতয়স্তথা॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

অনুবাদ। স্ত্রীলোকদিগকে বাল্যকালে পিতা, যৌবনে স্বামী, ও বৃদ্ধ বয়সে পুত্র রক্ষা করিবেন। অনাথা স্ত্রীলোকদিগকে জ্ঞাতি বা আত্মীয়গণ রক্ষা করিবেন।

"তস্মান্নারী পরৈর্যত্নাদদৃষ্টা কৃতিভিঃ কৃতা।
অসূর্য্যম্পশ্যা যা দারা শুদ্ধান্তশ্চ পতিব্রতাঃ।
স্বামিসাধ্যা চ যা নারী কুলধর্ম্মস্থিতা স্থিতা।
কান্তেন সার্দ্ধং সা কান্তা বৈকুণ্ঠং যাতি নিশ্চিতম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

অনুবাদ। স্ত্রীজাতি সম্মানার্হা বা যত্নে রক্ষিতব্যা, এইজন্য তাহাদিগকে যাহাতে কেহ দেখিতে না পায়, পরম কৃতিগণ সেইরূপ করিবেন। যে সমস্ত দারা

অসূর্য্যম্পশ্যা, তাঁহারা শুদ্ধা ও পতিব্রতা (এইরূপ প্রায় দেখা গিয়া থাকে)। স্বামিসাধ্বা ও কুলধর্ম্মভয়ে স্থিতা কান্তা, (মৃত্যুর পর) কান্তের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন।

প্রাচীন আর্য্যগণ নারীদিগের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া যে তাঁহাদিগকে অন্তঃপুর নামক কারাগারবিশেষে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, ইহা কাহারও মনে না করাই ভাল। সাধ্বী স্ত্রীলোকগণ চরিত্র দ্বারা নিজেই নিজকে রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহাদের অন্তঃপুরে থাকা না থাকা সমান।

"অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধা পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥"

মনুসংহিতা।

অনুবাদ। আপ্ত পুরুষগণ কর্ত্তৃক গৃহে রুদ্ধা থাকিলেও দুঃশীলা স্ত্রীকে অরক্ষিতা বলিয়া জানিবে। যে সাধ্বী স্ত্রীচরিত্রপ্রভাবে আপনি আপনাকে রক্ষা করেন, তিনিই সুরক্ষিতা।

প্রাচীন কালে সম্মানপ্রদর্শনার্থ মহিলাদিগকে অন্তঃপুরে রাখা হইত বটে, কিন্তু প্রয়োজনবিশেষে সাধারণসমক্ষে উপস্থিত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে নিষেধ ছিল না। মহীপালগণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞোপলক্ষে দীক্ষিত হইয়া মহিষীর সহিত প্রকাশ্য স্থানে উপবেশন করিতেন। পতিপ্রভৃতি আত্মীয় সহ যোষিদ্গণ তীর্থভ্রমণে গমন করিতেন। যে সমস্ত বিদ্যালয় বা চতুষ্পাঠী নারীদিগের শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তথায় গমন তাঁহাদের নিষেধ ছিল না। পুরবনিতাগণ তপোবনে মুনি ও মুনিপত্নীদিগের নিকটে ধর্ম্মোপদেশলাভার্থে গমন করিতেন। নরপতিদিগের অন্তঃপুরের সন্নিকটে এক একটী পুষ্পবাটিকা থাকিত, তথায় রাজমহিষী ও রাজকন্যাগণ দাসী ও সখীদিগকে সঙ্গে লইয়া, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে বায়ুসেবনার্থে গমন করিতেন। সভাগৃহে ও নৃত্যগীতাদি-উৎসব-দর্শনস্থানে মহিলাগণ গমন করিতেন, তাঁহাদের বসিবার জন্য পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত। ধাত্রী, যোদ্ধ্রী, শিল্পব্যবসায়িনী ও উপদেশাকাঙ্ক্ষিণী রমণীগণ যখন যেখানে প্রয়োজন বোধ করিতেন, সেইখানেই যাইতেন। কোন কোন বিদুষী রমণী বিচার বা শাস্ত্রীয় তর্ক করিবার নিমিত্ত পণ্ডিতসভায় গমন করিতেন। অবশ্য এ কথা এখানে বলা বাহুল্য যে, তাঁহাদের উপবেশনস্থানও তথায় পৃথক্ থাকিত। কোনও কোনও পতিবিরহিণী সাধ্বী পতির অন্বেষণার্থে আপ্তজন সহ দেশবিদেশে পর্য্যটন করিতেন। উপায়হীনাবস্থা হইলে বা প্রয়োজনবিশেষ উপস্থিত হইলে, স্ত্রীলোকগণ মৃত আত্মীয়ের শব বহন করিয়া লইয়া শ্মশানে যাইতেন এবং দাহাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতেন। বাহুল্যভয়ে উপরিবর্ণিত বিষয়ের দৃষ্টান্ত ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়া হইল না। শাস্ত্রানুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, অনেক ধর্ম্মকার্য্যে, অনেক লৌকিক কার্য্যে, অনেক উৎসবে, অনেক বিপৎপাতে ও অনেক

বিপদ্‌দ্ধরণকার্য্যে, মহিলাগণ অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য স্থানে গমন করিতেন। যদি অপরাধীদিগের কারাব-রোধের ন্যায় নারীদিগকে অবরোধ নামক কোন স্থানে অবরুদ্ধ রাখাই প্রাচীন আর্য্যদিগের অভিপ্রেত হইত এবং সম্মান প্রদর্শনার্থে তাহাদিগকে অন্তঃপুরে রাখা না হইত, তাহা হইলে কোন প্রকারেই তাহাদিগকে প্রকাশ্য স্থানে যাইতে দেওয়া হইত না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির পূজারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন পূজাঙ্গীয় কার্য্যের মধ্যে কুমারীপূজার বিধান আছে। অবিবাহিতা অল্পবয়স্কা ব্রাহ্মণকন্যাকে কুমারী কহে। যেমন দেবদেবীকে আসন স্বাগতাদি ষোড়শো-পচারে পূজা করিতে হয়, তেমনি কুমারীদিগকেও ষোড়শোপচারে পূজা করা হইয়া থাকে। অন্নদাকল্প নামক তন্ত্র বিশেষে উক্ত আছে, সাধক অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে এবং রবিসংক্রমণকালে, বস্ত্রালঙ্কার ও ভক্ষ্য ভোজ্যাদি উপকরণ দ্বারা কুমারীকে পার্ব্বতীর সহিত অভেদ ভাবিয়া পূজা করিবে। ইহাতে দেবীর প্রসন্নতা এবং সাধকের শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়।

সধবাকেও ভগবতীর অংশ বোধে, সম্মান করিবার নিয়ম আছে। কোন কোন ব্রতোপলক্ষে বা কৃত্যবিশেষে সধবাকে ভোজন করাইবার ও তাহাকে দান করিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়।

হিন্দুগৃহে বিধবাগণ তপস্বিনীদিগের ন্যায় সম্মানভাজন। বিধবাগণ, বিলাসকর বোধে স্রক্‌চন্দনভূষণাদি, অপবিত্রকর বোধে কতিপয় খাদ্য দ্রব্য এবং সংযম-বিরোধকর বোধে কতিপয় আচার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠার একশেষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সদাচারবতী আর্য্যবিধবা নারীকে দেখিয়া তাঁহাকে স্বর্গাবতীর্ণা দেবী, মূর্ত্তিপরিগ্রাহী ধর্ম্ম বা গৃহস্থাশ্রমে প্রচ্ছন্নস্থিত তৃতীয়াশ্রমের ন্যায় বোধ হয়। এই জন্য বিধবা গৃহস্থাশ্রমস্থা হইলেও তাঁহাকে ব্রহ্মচারিণী বা বানপ্রস্থাশ্রয়িণী তাপসীর ন্যায় সম্মান করিতে হয়।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে গর্ভিণী স্ত্রীলোক বিশেষ দয়ার পাত্রী। গর্ভিণীর যথোপযুক্ত পরিচর্য্যাসাধনের জন্য যে করণীয় আছে, তাহাকে গর্ভিণ্যবেক্ষণ বা কুমারভৃত্যা কহে। উপযুক্ত ধাত্রী ও সুচিকিৎসক গর্ভিণীর সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিবেন। পুরাণ ও সংহিতাশাস্ত্রে লিখিত আছে বাড়ীতে গর্ভিণী স্ত্রীলোক থাকিলে তাহাকে অগ্রে ভোজন না করাইয়া গৃহস্থ আহার করিবে না।

সন্তানকে গর্ভে ধারণ, পোষণ ও অলৌকিক স্নেহ করেন বলিয়া জননী সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয়া। অভিধানের টীকাকার ভরত বলিয়াছেন, "মান্যতে পূজ্যতে যা সা মাতা"— অত্যন্ত মান্য বা পূজা করিতে হয় বলিয়া জননী "মাতা" বলিয়া অভিহিতা হন। পুরাণ ও সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে "পিতা

অপেক্ষাও মাতা পূজনীয়া। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া সর্ব্বাগ্রে মাতা ও পিতাকে প্রণাম করিবে। মাতা ও পিতা যদি এক স্থানে থাকেন, তবে অগ্রে মাতাকে প্রণাম করিয়া পরে পিতাকে প্রণাম করিবে।" মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে, "মাতাকে ভক্তি করিয়া প্রসন্না করিতে পারিলেই পার্ব্বতী দেবী সন্তুষ্টা হন"। মনুসংহিতাতে লিখিত আছে—"বৃদ্ধ মাতাপিতাকে প্রতিপালন করিবার জন্য যদি হীন কার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, তবে তাহাও করিবে।"

মার স্নেহ যেমন অনির্ব্বচনীয় তেমনি মা এই নামটীও কি জানি কি দিব্যভাবে পরিপূর্ণ। শিশু বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই মা বলিয়া ডাকিলে হৃদয়ে যে শান্তি প্রাপ্ত হয়, ভাষায় এমন কোন কথা নাই, যাহা দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যায়। "মা" এই শব্দ উচ্চারিত হইলে কখন ভক্তিভাব, কখনও বা স্নেহভাবের উদ্রেক হয়, বোধ হয় এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে পরভার্য্যাকে মাতৃ-সম্বোধনে আহ্বান ও মাতৃবৎ চিন্তনের অনুশাসন আছে;—

মাতরিত্যেব শব্দেন যাঞ্চ সংভাষতে নরঃ।
সা মাতৃতুল্যা সত্যেন ধর্ম্মঃ সাক্ষী সতামপি

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্॥

অনুবাদ। মনুষ্য মা বলিয়া যাহাকে সম্ভাষণ করেন, তিনি সত্য সত্যই মাতৃতুল্যা অর্থাৎ তাঁহার সহিত মাতৃবৎ ব্যবহার করিবে। এ বিষয়ে ধর্ম্মই সাধুদিগের সাক্ষী।

কোন কোন স্ত্রীলোকে মাতৃধর্ম্ম আছে বলিয়া আমাদিগের শাস্ত্রে অনেক প্রকার মাতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুকালে যেমন মাতৃস্তন্য পান করা যায়; তেমনি ধাত্রী বা অন্য কোন স্ত্রীলোকের স্তন্য পান করা গেলে তাহাকেও মাতৃতুল্য সম্মান করিবে। মাতৃষসা, পিতৃষসা, মাতুলানী, পূর্ব্বজপত্নী, পিতৃব্যপত্নী শ্বশ্রূ প্রভৃতি পূজনীয়া আত্মীয়া মহিলারা মাতার ন্যায় স্নেহ করেন বলিয়া ইহাঁরাও মাতৃতুল্য সম্মানার্হা।

(ক্রমশঃ।)

বিধবা।

তিন অক্ষরের "বিধবা" এই শব্দটী কি ভয়ানক! কি মর্ম্মভেদী যাতনাদায়ক! হিন্দুসমাজের গৃহে গৃহে এ শোকবহ্নির অভাব নাই। বিধবা রমণীদের এ সংসারে সান্ত্বনা নাই, আশা নাই, তাহাদের জীবন জলন্ত বাড়বানল। তাহারা বিষম তাপে দিবানিশি দগ্ধ হয়, ও কিয়ৎ পরিমাণে আত্মীয় স্বজনকে দগ্ধ করে।

বিধবা-জীবন কি প্রকার সন্তর্জ্জিত, বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছনাময়, তাহা ভুক্তভোগী

ভিন্ন কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। স্ত্রীলোকের স্বামী যে কি পদার্থ এবং কত সাধনার বস্তু, তাহা সকল স্ত্রীলোকে বুঝে না। স্বামী দেবতা, স্ত্রীর ইহপরকালের সঙ্গী। প্রকৃত স্বামী স্ত্রীর শুভপ্রার্থী হইয়া সংসারে প্রবেশ করেন, জীবনে মরণে সেই একই উদ্দেশ্য সাধিত করিয়া অনন্তের দিকে অগ্রসর হন, এবং পত্নীকেও অগ্রসর করেন। প্রকৃত প্রণয় যেখানে, প্রকৃত পতিপত্নীত্ব যেখানে, সেখানে পতি-পত্নী পরস্পরে পরস্পরের ইহ পরকালের সঙ্গী। প্রকৃত প্রণয় একের অভাবে মলিন বা বিলুপ্ত হয় না। বিশুদ্ধ স্বর্ণ যেমন পুনঃ পুনঃ পোড়াইলেও বিবর্ণ না হইয়া বরং আরও উজ্জ্বল হয়, প্রকৃত প্রণয়ও সেইরূপ বিরহ-আগুনে অধিকতর সমুজ্জ্বল হয়, এবং অতি পবিত্র মধুরভাবে প্রণয়ীকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। বস্তুতঃ প্রকৃত প্রণয়ের মিলনাপেক্ষা বিচ্ছেদের আকর্ষণশক্তি অধিক। কিন্তু বাসনা-মলে মলিন প্রণয়ের সম্বন্ধ জীবনাবধি। এই জন্যই আমরা স্বামীর দেহত্যাগে স্বামীর অভাবে অত্যন্ত অভাব বোধ করিয়া যার পর নাই বিহ্বল হইয়া পড়ি। আমাদের এ বিহ্বলতা কতক পরিমাণে স্বার্থবিজড়িত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বামীর অভাবে হৃদয়ে দাগ বসিবে না বা উপেক্ষায় ভাসাইয়া দিবে, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব। স্বামীর মৃত্যুতে যে স্ত্রীর হৃদয় অক্ষত থাকে, এবং যে স্ত্রী স্বামী ও প্রণয়কে উপেক্ষায় ভাসাইয়া দিতে সমর্থা, তিনি "পত্নী" এই মহৎ আখ্যার অনুপযুক্তা। বস্তুতঃ কখন কোন রমণীর পক্ষে ইহা সম্ভব হয় নাই ও হইবে না।

স্বামীর অভাব হইলে কেহ কেহ শোকাতুরা বিধবাকে উপদেশ দেন যে "এ সংসারে সব মিথ্যা, পত্নী পতি আদি সম্বন্ধ জীবনাবধি, এ সব বৃথা মায়া এবং মোহ মাত্র, অতএব অতীতের স্মৃতি অন্তর হইতে মুছিয়া ফেল। বিধবা রমণী সাবধান! ঐ সুধাস্মৃতি কখনও ভুলিও না। ঐ স্মৃতি তোমাকে জগৎপতির প্রেমাস্বাদ বুঝাইবে। স্বামীর প্রেম ভগবৎপ্রেমের অপূর্ণাংশ, উহাই কালে পূর্ণ হইয়া ভগবৎপ্রেমে পরিণত হইবে। বিচ্ছেদ আগুনের তাপ প্রাণে যত অধিক পশিবে, ভবিষ্যৎ জীবনের পথ তত পরিষ্কার হইবে।

স্বামী স্ত্রীলোকের জীবনে মরণে সুহৃদ, স্বামী যোগ কর্ম্ম ভক্তি, স্বামীই স্বর্গ-মোক্ষ-অর্থ, স্বামীই গুরু জ্ঞানগম্য, স্বামীই ইষ্ট, ও উপাস্য দেবতা। এবং স্বামিপ্রেমই স্ত্রীজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, আমরা অনেকেই সময়ে এই উপাস্য দেবতা চিনিতে পারি না। বিধাতার কি এক কৌশলময় নিয়ম! অনায়াসলভ্য জিনিষের মূল্য প্রায় বুঝা যায় না। বিশেষতঃ অভাবে না পড়িলে কোনও বস্তুরই প্রকৃত মূল্য হৃদ্‌বোধ হয় না। বিধবাজীবনেই স্বামী ও প্রণয়ের মহত্ত্ব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া সঙ্কটময় বৈধব্য জীবনকে রক্ষা

করে। মৃত ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তিকে রক্ষা করে, ইহা হাসির কথা বটে। অন্যে হাসে হাসুক, কিন্তু বিধবা ভগিনি! তুমি হাসিও না। উহা সত্য কথা। উহা শুনা কথা বা কোন গ্রন্থের কথা নহে, কল্পনার ভাবও নহে। সাধারণতঃ যে সব বিধবা ভগিনীকে পতিত হইতে দেখা যায়, আমার বিশ্বাস, তাহাদের পতনের মূল কারণ তাহাদের মৃত স্বামীর প্রতি ভক্তির অভাব এবং তাহাদের প্রণয়বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। বিধবা-জীবন কি প্রকার সঙ্কটময় ও বিড়ম্বিত, তাহা বিধবামাত্রই অবগত আছেন। রমণীহৃদয় সাধারণতই অতি কোমল এবং পরাশ্রিত। কোমল লতা যেমন অন্য আশ্রয় ব্যতীত মাথা তুলিতে পারে না, পরাশ্রিতা নারিজাতিও পুরুষের আশ্রয় ব্যতীত দাঁড়াইতে পারে না। এইরূপ পরাশ্রিতা নারীজাতির একাকী বৈধব্যজীবন কি প্রকার সঙ্কটময় তাহা বর্ণনার অতীত। বিধবা রমণীকে পাপ-প্রলোভনময় বিপদ্‌সঙ্কুল এই জগতে একাকী জীবন ধারণ করিতে হইবে। তাহাকে দুটা ভাল কথা বলিয়া সুপথ দেখাইয়া দিতে এ জগতে কেহ নাই। তাহাকে একাকী জীবনের লক্ষ্য ঠিক্ রাখিয়া গন্তব্যপথ চিনিয়া লইয়া সর্ব্বদা বিপদ্-বাধাপূর্ণ পথে চলিতে হইবে। একে বিষম আঘাতে হৃদয় চূর্ণ! প্রাণে অনন্ত নৈরাশ্যের অতৃপ্ত পিপাসা! সংসার দাবানলময়! নিজের জীবন যেন তীব্র হলাহল! এ অবস্থায় আপনাকে ঠিক রাখিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যপথ নির্ব্বাচন করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া কি প্রকার কষ্টসাধ্য, এই অবস্থায় কত ধৈর্য্য ও কত শক্তির প্রয়োজন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বিধবাজীবনের এই অবস্থায় শক্তি ও ধৈর্য্য নিজের নয়। স্বর্গীয় স্বামিদেবতার পবিত্র প্রণয়ের সুধাময় ফলস্বরূপ; রূপান্তরে শুভময় জগৎপতির করুণা-কটাক্ষ বই আর কিছুই নহে। নতুবা রমণীজীবনে এমন কোন শক্তি নাই, যাহার সাহায্যে ঐ দুর্য্যোগের সময়ে ঠিক থাকিয়া সে নিজ লক্ষ্যপথে নিরাপদে অগ্রসর হইতে পারে।

তাই বলিতেছিলাম, স্বামীর অভাব হইলেও পবিত্র দাম্পত্যপ্রণয় কখন বিলুপ্ত হয় না। যে দম্পতীতে প্রকৃত পবিত্র প্রণয় ছিল, শুধু সে রমণীই বৈধব্য-জীবনের সঙ্কটময় অবস্থায় স্বামি-স্মৃতি-ধ্বজা ধরিয়া, অতীত প্রেমের সমুজ্জ্বল প্রদীপ হস্তে করিয়া, পবিত্র প্রণয়জাত শক্তি-ধৈর্য্য হৃদয়ে লইয়া, নানা প্রকার প্রলোভনপূর্ণ ও বিপদ্‌সঙ্কুল অন্ধকারময় পথে নৈরাশ্যের বজ্রাঘাতে মুহ্যমান হৃদয় লইয়া লক্ষ্যোদ্দেশে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন। অতীত স্মৃতি বিধবা রমণীর অতি আদরের সামগ্রী এবং আত্মরক্ষার পক্ষে অক্ষয় কবচ। স্বামী-শব্দটি বড়ই মহৎ। স্বামী স্ত্রীজীবনের যা কিছু সকলি। শুধু স্বামী হইতেই রমণীজাতি পরকে আপন

করিতে শিক্ষা করে। নব-বিবাহিতা বধূ গৃহে আনিলে, তাহার সমুদায় অপরিচিত। শ্বশুর শাশুড়ী হইতে দাস দাসী পর্য্যন্ত কাহাকে ত সে চিনে না। এমন কি, স্বামী পর্য্যন্ত অপরিচিত। তথাপি "স্বামী" এই শব্দটীর কি মোহিনী শক্তি! সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবারের মধ্যে অপরিচিত স্বামীর সহিত প্রথম ঘনিষ্ঠতা হয়, এবং অপরিচিত আত্মীয়গণ স্বামীর, শুধু এই সূত্রে নব-বিবাহিতা বালিকার প্রাণ অল্পাধিক পরিমাণে তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়-বন্ধন যত গাঢ় হয়, স্বামীর প্রিয়জনের সহিত ততই সৌহৃদ্য ও ঘনিষ্ঠতা অধিক হয়। এইরূপে দেখা যায়, দম্পতীর প্রণয়বন্ধন যে পরিমাণে পবিত্র, নিঃস্বার্থ ও গাঢ় হয়, স্বামীর স্বজনগণের প্রতি রমণী-গণের ব্যবহারেও সেই পরিমাণে তারতম্য হইয়া থাকে। বিধবাজীবনেও তাহা স্বাভাবিক, বরং বিধবাজীবনে ইহা আরও স্পষ্টরূপে বিকাশ পায়।

অভাগিনী বিধবা রমণী সাক্ষাৎ ভাবে স্বামি-দেবতার সেবায় ত বঞ্চিতা; এই হেতু স্বামীর প্রিয় জিনিষ তাহার বড়ই আদরের। এক দিকে যেমন স্বামীর প্রিয় জিনিষ বিধবাজীবনের আদরের; অপর দিকে স্বামীর প্রিয় কার্য্যও তদ্রূপ। স্বামী রমণীর পূজার দেবতা, কিন্তু এ পূজা পুষ্পপত্রে হয় না। মহাজনগণ বলেন, ভগবানের প্রিয় কার্য্যসাধনই তাঁহার উপাসনা। স্বামি-দেবতার সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা। স্বামীর প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহার পূজা।

মৃত স্বামীর মাতা পিতা প্রভৃতি গুরু-জনের এবং তাঁহার স্নেহাস্পদ ভাই-ভগিনী ও সন্তান প্রভৃতির প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার ও তাহাদের সেবা যত্ন, এবং তিনি যে কার্য্য ভাল বাসিতেন, তাহাতে সচেষ্ট থাকা, যে ভাবে জীবন গঠিলে তিনি সুখী হইতেন, সেই ভাবে আপনাকে গঠন করা প্রভৃতিই তাঁহার সেবা বা পূজা। অবশ্য সদসৎ বুঝিয়া। কিন্তু এই কার্য্যেই আবদ্ধ হইয়া, মায়ায় ভুলিয়া আত্মবিস্মৃতা হইলে চলিবে না। তাঁহার প্রিয়জনের সেবা ও তাঁহার প্রীতির কার্য্যে আনন্দের সহিত সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া, সর্ব্বদা মনে এই ভাব জাগাইতে হইবে যে, এ সব কিছুই আমার নয়। এ সবই তাঁহার, আমিও তাঁহার। তাঁহার আমি তাঁহারই কার্য্য করিতেছি। মোটের উপরে যথোপযুক্ত-রূপে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু শুধু কর্ত্তব্য বলিয়া করিতে গেলে বিধবাজীবনে তাহা বড়ই শুষ্ক ও স্বাদহীন বোধ হইয়া বিরক্তিজনক হইবে। সবই স্বামীরই, এ ভাবে সকল কার্য্য ও ব্যক্তির প্রতি প্রাণের অপূর্ব্ব প্রীতির ভাব আসিবে এবং এ সেবাতেই হৃদয়ে পরম আনন্দ অনুভূত হইবে। এই সেবাই ক্রমে ভগবৎ-সেবার সোপানস্বরূপ হইবে। সাবধান! আপনাকে মোহে ডুবাইয়া দিয়া জীবনের উদ্দেশ্য কেহ বিস্মৃত হইবেন না। লোকে ষোড়শোপচারে নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার

পূজা করিয়া থাকে। সেই বাহ্যিক পূজাই ভগবৎপ্রাপ্তির সোপানস্বরূপ। এই স্থানেও এইরূপ সেবাই যে ভগবৎপ্রাপ্তির সোপান, ইহা কেহ বিস্মৃত হইবেন না। লোকে ধাতু প্রস্তর বা মৃত্তিকায় নির্ম্মিত বিগ্রহের পূজা করিয়া চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া সিদ্ধ হয়। আমরা চৈতন্যময় বিগ্রহের সেবা করিয়া ও চৈতন্যময় প্রণয়ীর প্রণয় ধ্যান করিয়া কি বিফলমনোরথ হইব? (ক্রমশঃ)

———

পূজ্যপাদ ভক্তিভাজন

উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণোপলক্ষে।

সংসারে কত জ্ঞানী, কত কর্ম্মী, কত ভক্ত আছেন। জ্ঞানবান্, কর্ম্মী বা কর্ম্মানুরাগী ভক্ত দুর্লভ নহে, কিন্তু জ্ঞানী কর্ম্মানুরাগী ভক্ত সংসারে বড় বিরল। জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য ও কর্ম্মের ব্যস্ততা যখন ভক্তের ব্যাকুলতা ও প্রেমপ্রবণতার যুগে মিশিয়া যায়, তখন মানবজীবন প্রকৃত প্রয়াগে পরিণত হয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এ তিনটী মুক্তিসাধনায় প্রধান অবলম্বন। যখন ইহারা ত্রিবেণীধারার ন্যায় কোন জাগতিক আধারে সম্মিলিত হয় তখন মানবজীবনের সেই পুণ্য তীর্থে সেই প্রীতি ও পবিত্রতার সাগরসঙ্গমে প্রেমের বান ডাকিয়া আসে। তখন তীরস্থিত কণ্টক, কঙ্কর ভাসিয়া যায় এবং পুণ্যধৌত বেলাভূমি প্রেমের দান বুক পাতিয়া গ্রহণ করে। যখন কোনও সৌভাগ্যবান্ মানব জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি, এই তিনের সামঞ্জস্য নিজ জীবনে প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হন, তখন মানবত্ব ও দেবত্বের বড় বেশী পার্থক্য লক্ষিত হয় না। মানব যখন ভক্তিগদ্গদচিত্তে জ্ঞানের নয়নে নিজ নিজ কর্ম্মফল দেখিতে পায় তখন তাহার হৃদয়ে যে আত্মানন্দের মধুর ভাব আসিয়া পড়ে, সেই ভাবে সে, জগৎকে আপন হৃদয়ে টানিয়া লয়; জগৎও সেই হৃদয়স্বর্গে অবস্থিত হইয়া আপনা ভুলিয়া সেই মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া থাকে। চাহিয়া দেখে কি? দেখে, দেবকল্প সাধু পুরুষ আত্মপর ভুলিয়া জগতের কাজে নিযুক্ত। দেখে প্রেমিক প্রেমাকুলচিত্তে আশে পাশে প্রেম বিলাইতেছেন। দেখে, জ্ঞানী নিজ জ্ঞানের মহিমায় মুগ্ধপ্রাণ হইয়া নিজ হৃদয়ের তত্ত্বকথা গম্ভীরভাবে বলিয়া যাইতেছেন। ধন্য জগৎ! ধন্য! ধন্য সে দেশের মাটি! যে দেশে এমন লোক জন্মে। এমন পবিত্রচেতা সাধুপুরুষ যে দেশের মাটি মাড়াইয়াছেন, সে দেশ তো পবিত্র হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের নৈতিক দুরবস্থা যখন চিন্তাশীল মানবহৃদয়ে উদ্বেগের সঞ্চার করে, তখন ঐ যুগপ্রবর্ত্তনকারী মানবের পূত চরিত্র হৃদয়ে আশা ও সুখ

আনিয়া দেয়। এতদিন তাই আমরা ঈরূপ আশায় আশান্বিত ছিলাম, ছিলাম কেন, এখন ত আছি। যদিও সে আদর্শচরিত্র মহাপুরুষকে আজ আমরা হারাইয়াছি, তথাপি তাঁহার চরিত্রকথা, তাঁহার সাধনা, তাঁহার সিদ্ধি পাপী মানব-সন্তানের নিকট পরিত্রাণের কি শুভবার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে! আজ কি বিশ্বাস, কি জ্ঞানবিশ্বাস, কি কর্ম্মবিশ্বাস, কি ভক্তিবিশ্বাস মানব-প্রাণে জাগিতেছে। উঠ মানব, উঠ! আজ যে ঐ ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র দেবচরণে আত্মবিক্রয় করিলেন, তদ্বিনিময়ে তিনি কি পাইলেন। তিনি পাইলেন, শান্তি, তৃপ্তি, আশা ও সুখ! যদি তুমি,—শান্তি পাইতে চাও, যদি তুমি পরিতৃপ্ত হইতে চাও, যদি তুমি আশান্বিতহৃদয়ে সুখের সাগরে ভাসিতে চাও, তবে এস, এই একাধারে জ্ঞানী কর্ম্মী ও ভক্তের জীবনচরিত্র সমালোচনা কর। নিরাশপ্রাণ! ভগ্নহৃদয়! তুমি এস, আশা ও আকাঙ্ক্ষা তোমারি জন্য। সাংসারী বৈষয়িক তুমিও, এস সুব্যবস্থা ও কর্ম্মানুরাগ তোমারি জন্য। জ্ঞানী ভক্ত তোমরাও এস, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রেম তোমাদেরি জন্য।

ইংরাজ কবি বলিয়াছেন (Child is the father of man.) এ উক্তির সত্যতা মৃত মহাপুরুষের জীবনে স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি হইয়াছিল। বালককাল হইতে তাঁহার জ্ঞানের তৃষ্ণা অতি প্রবল ছিল। জগতে যাঁহারা বড় লোক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বাল্যজীবনের ঘটনাবলী পরজীবনের মহত্বের পূর্ব্বাভাস প্রদান করিয়া থাকে। যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় মানবের যে বিশেষত্ব তাহাকে অন্য হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়, বাল্যে তাহার উন্মেষ দেখিতে পাই। ধর্ম্মানুরাগ বালক উমেশচন্দ্রের জীবনে কে জানে কোন্ স্বপ্নস্বর্গের সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। বুঝিবা সেই সময়ে তিনি সে উন্মুক্ত দ্বারপথে দেবতরু পারিজাতের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন। বুঝি বা উপাসনাশীল দেবকন্যাদিগের মধুর স্তুতিগীতি সেই দ্বারপথ দিয়া তাঁহার কর্ণে স্বর্গসুখের প্রিয়বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছিল। বুঝি বা, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তখনই তাঁহার নয়ন-সম্মুখে মহত্বের কি অপূর্ব্ব রাজ্য বিস্তার করিয়া দিয়াছিল। তাই আমরা এই জ্ঞানযোগীকে পাইলাম। তাই আমরা এই কর্ম্মযোগীকে পাইলাম। তাই আমরা এই ভক্তিযোগীকে পাইলাম। তিনি দরিদ্রতা, অভাব ও অসুবিধার সঙ্গে যুঝিয়া বিজয়ী বীরের ন্যায় সংসারে প্রবেশ করিলেন। মানুষ বুঝিল, Where there is a will there is a way—মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা অদৃষ্টবাদীর কূটতর্কজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিল। জগতের জড়তা, অভাব, অশান্তি, বিরোধ আধ্যাত্মিক উন্নতিস্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়। দুঃখ দারিদ্র্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞার

নিকট অধীন ভৃত্যের ন্যায় নতশির হয়।

জীবনে কি অনন্ত কর্ম্মজগৎ তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছিল! মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত একটী দিনের জন্যও সে পুণ্যজগৎ তাঁহার নিকট লুক্কায়িত থাকে নাই। কর্ম্ম-জগতের হিতার্থে কর্ম্ম তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। কর্ম্মময় সে জীবনের পুণ্যগাথা উপকথার ন্যায় বাঙ্গলার ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হউক। বাঙ্গালী শিখুক, কাজে কত সুখ! মানুষ বুঝুক, কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ। তিনি তাঁহার জীবন আপনার মনে করেন নাই। সে জীবন দেবকার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কর্ম্ম-কর্ম্ম-কর্ম্ম-কর্ম্মই মানুষের ধর্ম্ম। তিনি তাই বুঝিয়াছিলেন। তাই বুঝিয়াছিলেন বলিয়া অত পরিশ্রমের ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। কেহ কখন তাঁহাকে শ্রমকাতর দেখে নাই। কর্ম্মের জন্য এমন আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কয়টা পাওয়া যায়? কি অধ্যয়নে, কি অধ্যাপনায়, কি সভায় কি সমাজে, কেহ তাঁহাকে ক্ষণমাত্রও কর্ম্মবিরত দেখে নাই। বৃক্ষতলবাসী যোগী যেমন সর্পদষ্ট অঙ্গুলীর ন্যায় সংসারচিন্তা ত্যাগ করিয়া তাঁহার হৃদয়দেবের অনুধ্যানে প্রাণমন সমাহিত করেন, আমাদের এই কর্ম্মযোগীও তেমনি বিশ্রাম ও বিলাসের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মে দৃঢ় মনঃসংযোগ করিতেন; কেহ তাঁহাকে টলাইতে পারিত না, কেহ তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিত না। রাজর্ষি জনক কর্ম্মযোগের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, সেই ভক্তহৃদয়ের পরীক্ষিত সত্য কলির মানুষের কাছে লুক্কায়িত থাকে নাই। তেমনি উজ্জ্বল ভাবে, তেমনি প্রকটভাবে তাহা প্রকাশ রহিয়াছে ও থাকিবে। ধন্য সেই মানুষ! যে আপন জীবন ঐ মহৎ দৃষ্টান্তানুসারে চালনা করিতে পারে। দেবতা তাহারি মস্তকে সম্মান ও যশের মুকুট পরাইয়া দেন। হায়! সে যশোগর্ব্বে গর্ব্বিত, সে সম্মান-ভূষণে ভূষিত মূর্ত্তি আমাদের বাহনয়ন-পথ হইতে অপসৃত হইল! দেখিতে দেখিতে পূর্ণিমা রজনীর মধুময়ী জ্যোৎস্নার ন্যায় বিলীন হইয়া গেল। আজ যে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ-চন্দ্র পশ্চিমাকাশে মিলাইয়া গেল, সে চন্দ্র কি আর উঠিবে? সমুদ্রসম মানবহৃদয় যে চন্দ্রদর্শনে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, মানব-হৃদয় কূলে কূলে যদ্দর্শনজনিত ভক্তির জোয়ারে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সে চন্দ্রের কি দেখা আর পাইব? আবার কি প্রাচী-দিক্‌মূলে বিজলীরেখার ন্যায় দ্বিতীয়ার চাঁদ ভাসিয়া উঠিবে? হায়, কে জানে, উঠিবে কি না! উঠুক আর না উঠুক, কিন্তু সে স্নিগ্ধ চন্দ্রকরতলে সমাজকাননে যে সংস্কারতরু মঞ্জুরিত হইয়াছে এবং যে তরুর ফুলে ফলে জ্ঞানের সৌগন্ধ ও ধর্ম্মের স্বাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তো বাঁচিয়া থাকিবে? সে শুভ্র জ্যোৎস্নায় ভাবের উদ্যানে যে ভক্তি-প্রীতি-বিনয়ের কুসুম ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার সৌগন্ধ তো চিরকাল মানবকে শান্তির ত্রিদিব-দ্বার খুলিয়া দিবে? তাহা

হইলেই তো সমগ্র মানবসমাজ ধন্য হইবে।

শোকের প্রথম উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত-হৃদয়া স্রোতস্বতীর ন্যায় আপনাকে আপনি ধরিয়া রাখিতে পারে না; কিন্তু কালে যখন উচ্ছ্বাস প্রশমিত হয়, তখন নির্ম্মল-হৃদয়া স্রোতস্বতী যেমন নীরবে বহিয়া যায়, শোকভারগ্রস্ত মানবমন তেমনি নীরবে, তেমনি শান্তিতে বহিয়া যায়। মানুষ যদি দেবতার আনন্দে আনন্দিত হইতে পারিত, মানুষের সুখ ও দেবতার সুখ যদি একই কারণোদ্ভূত হইত, তাহা হইলে মানবের জাতীয় ইতিহাসে আজ একটা পুণ্য দিন বলিয়া কথিত হইত। কিন্তু মানুষের সে অদৃষ্ট, সে সুখ বিধাতা লেখেন নাই। মৃত্যুতে মানুষ আনন্দ করিতে শেখে নাই। তাইতো আজ আমরা শোকে এত অধীর। কেন শোক করি, কিসের শোক? আজ প্রবাসী সন্তান বহুদিন পরে পিতার কাছে ফিরিয়া যাইতেছে বলিয়া কি শোক করি? আজ কয়েদী কারাপ্রাচীর অতিক্রম করিয়া স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু সেবন করিতেছে বলিয়া কি শোক করি? আজ ভক্ত মুক্তিলাভে সমর্থ হইল বলিয়া কি শোক করি? তা যদি করি, তাহলে আমাদের মত নির্ব্বোধ আর কে আছে? আজি যে ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর যশোমালা গলায় পরিয়া সগৌরবে স্বর্গের দ্বারদেশে উপস্থিত, তাঁর জন্য আমরা হাসিব না কাঁদিব? যিনি তাঁহার জীবিতকালে সৎকার্য্যকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ ও সরল করিয়া লইয়াছিলেন এবং যিনি মৃত্যুকালে মনুষ্যস্বভাবকে অতিক্রম করিয়া, শারীরিক যন্ত্রণাকে অতিক্রম করিয়া মনকে স্বর্গরাজ্যের পথপ্রবেশে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাঁর জন্য হাসিব না কাঁদিব? যিনি যশ চান নাই, মান চান নাই, সুখ চান নাই, শান্তি চেয়েছিলেন; যিনি বিশ্রাম চান নাই, কার্য্য চেয়েছিলেন; যিনি সমাজ চান নাই, সংসার চান নাই, কর্ত্তব্য চেয়েছিলেন; যিনি অর্থ চান নাই, প্রভুত্ব চান নাই, ধর্ম্ম চেয়েছিলেন; তাঁর জন্য হাসিব না কাঁদিব? যাঁর কর্ম্মে বিরাগ ছিল না, কর্ম্মফলে দৃষ্টি ছিল না, যাঁর আনন্দে স্বার্থ ছিল না, তাঁর জন্য হাসিব না কাঁদিব? আমরা হাসিব ও কাঁদিব, দুইই করিব। মানুষের উন্নতি দেখিয়া, মানুষ যে দেবতার সমকক্ষ হইতে পারে ইহা ভাবিয়া আমরা হাসিব। আর আমরা পৃথিবীর জীব, স্বার্থপর পৃথিবীর জীব বলিয়া কাঁদিব। যখন অন্ধকার ভেদ করিয়া তরুণ তপন পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, তখন তাহা মানবপ্রাণে আনন্দেরই সঞ্চার করিয়া থাকে। সে কিরণস্পর্শে অলসতা ও জড়তা দূরে পলাইয়া যায়। মানুষ তখন সানন্দচিত্তে নিজ নিজ কর্ম্ম বাছিয়া লয়। আজ যে কুসংস্কারের ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া জগতের পূর্ব্ব ভাগে এক নব জ্ঞানের উদয় হইল, তাহা দেখিয়া কি মানবপ্রাণ আনন্দে নাচিয়া

উঠিবে না?এই জ্ঞান মৃত মহাপুরুষের সমস্ত জীবনব্যাপী অবিশ্রান্ত উদ্যোগ ও কর্ম্মের ফল। এই জ্ঞানসূর্য্য মৃত্যুর উদয়াচল হইতে আজ বাঙ্গলার পথে—বাঙ্গলার মাঠে তাহার কিরণমালা ছড়াইয়া দিতেছে। এ কিরণে তীব্রতা নাই, কেননা ইহা ভক্তি ও প্রেমের আবরণে আবৃত। ভক্তি ও প্রেম এ সূর্য্যরশ্মিকে ঢাকিয়া লইয়া পূর্ণিমার কৌমুদীতে পরিণত করিয়া দিয়াছে। তাই আজ সমগ্র মানব-প্রাণ আশান্বিতহৃদয়ে জগতের কার্য্যে আনন্দের সহিত যোগ দিতেছে। আশা ও আনন্দ, তাহাদেরি জন্য, যাহাদের নয়ন-সম্মুখে অধ্যবসায় ও সফলতা জীবন্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। আজ কর্ম্মী দেখিতেছেন যে, কর্ম্মফল তাঁহা হইতে বেশী দূরে নয়। জ্ঞানী বুঝিতেছেন যে, জ্ঞানের আলোক আর তাঁহার কাছে অপ্রকাশিত থাকিবে না। ভক্ত মনে করিতেছেন, ভগবান্ তাঁহার অতি সন্নিকটে। কে এ আশা আনিয়া দিল? মানবপ্রাণে কে আনন্দের ধারা ঢালিয়া দিল? ঐ জীবন, ঐ পুণ্যময়, প্রেমময়, কর্ম্মময় জীবন, আর ঐ অমৃতময় শান্তিময় মৃত্যু। এমন জীবন, এমন মৃত্যু কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? তাই আমরা এ মৃত্যুতে আনন্দ করিতে পারি; আর পারি কাঁদিতে। জীবনের আদর্শ, হৃদয়ের বন্ধু, প্রাণের দেবতা সেই আমাদের ধর্ম্ম-গুরুকে হারাইয়া কাঁদিব না তো কি করিব? মানুষ কাঁদে কেন? আত্মীয়বিরহে মানুষ কাঁদে কেন? তাহার স্বার্থে আঘাত লাগিবে বলিয়া। সে প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি না দেখিলে, তাহার নয়নের তৃপ্তি হবে না বলিয়া, এ বিষম পরীক্ষাসঙ্কুল সংসারে সে জ্ঞানগম্ভীর উপদেশ শুনিতে পাইবে না বলিয়া; সংসারে সুখ ও ভালবাসা আর সে উপলব্ধি করিতে পাইবে না বলিয়া। এ সবই তো স্বার্থ। তাই মানুষ কাঁদে। আজ সমস্ত বঙ্গের হৃদয় ভেদ করিয়া যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে, তাহার নিবৃত্তি কোথায় জানি না। তবে এটা জানি, এ পবিত্র ক্রন্দনে, এ ভগ্নহৃদয়ের অশ্রুজলে যে মাটি ভিজিয়া উঠিবে, তাহাতে শান্তি ও সুখের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে। এই কান্নার শেষে মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় আশার পূর্ব্বারুণপ্রভা জাগিয়া উঠে। মৃত্যু তখন আমাদের ধর্ম্মগুরুর শূন্য স্থান পূরণ করিয়া বসে। মৃত্যু বলে, "দেখ মানব! কি অনন্ত জ্ঞানরাশি আজ তোমার চক্ষের সম্মুখে ঢালিয়া দিলাম। তুমি বাছিয়া লও। তোমার জীবনোপযোগী জ্ঞান বাছিয়া লও। বাছিয়া লইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। সুখ ও শান্তি তোমারি জন্য।" মৃত্যু ডাকে "এস ভক্ত! এস সাধু! এস প্রেমিক! যদি মরিয়া অমর হইতে চাও, আমার কাছে এস; যদি শান্তি চাও, আমার কাছে এস; গৌরব চাও, তবে এস আমি তোমার মাথায় যশের মুকুট পরাইয়া দিই।" কে থাকিতে পারে? এ ডাক শুনিয়া কোন্ ভক্তহৃদয় আকুল হইয়া না উঠে? এই ডাক শুনিয়া আজ আমাদের শিক্ষাগুরু, জ্ঞানগুরু, কর্ম্মগুরু ঐ

মৃত্যুঞ্জয় অমৃতময় দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। আর কি স্থির থাকিতে পারেন? সিদ্ধিকে সম্মুখে দেখিয়া সাধনা কি স্থির থাকিতে পারে? যাও তবে দেব! যাও ঐ অমৃতধামে ঐ যে দেববালাগণ শুভশঙ্খরোলে স্বর্গের আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। স্বর্গের প্রশস্ত পথ ঐ যে দেখিতে দেখিতে কুসুমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। আজ অমর-ধামে কি মহামহোৎসব! আজ মৃত্যু-জয়ী কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর গৌরবরথে আরোহণ করিয়া স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত। তাই বুঝি ঐ দেবদুন্দুভি বাজিতেছে। তাই বুঝি এত তূর্য্যনিনাদের ঘটা! যাও তবে ঐ অমৃতধামে। যেথানে চির-আশা, চির-আনন্দ, সেথানে যাও। যেথানে শান্তিতে সুখ, সুখে শান্তি, সেথানে যাও। যেথানে মিলনে বিচ্ছেদ নাই, বিচ্ছেদে দুঃখ নাই, সেথানে যাও। যেথানে ভাল-বাসায় স্বার্থ নাই, স্বার্থে পাপ নাই, সেথানে যাও। যেথানে চিরপূর্ণিমা, চিরবসন্ত, সেথানে যাও। যেথানকার আকাশ ভক্তি ও প্রীতির সৌগন্ধে আমোদিত, সেথানে যাও। যেথানে ব্রহ্মপ্রেমের মধুময় উৎস উৎসারিত, সেথানে যাও। সেই উৎসতলে বসিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি সেই বারি পান কর, সেই জলে অবগাহন কর, শোক, তাপ, দুঃখ, যন্ত্রণা সব ধুয়ে যাবে। ধুয়ে যাবে সংসারের আবিলতা, সংসারের ধুলা কাদা। তখন শান্ত সমাহিতচিত্তে, ভক্তিপ্রেমা-প্লুত হৃদয়ে কল্পতরুতলে বস, দেখিবে মুক্তি সম্মুখে।

হে জাগ্রত জীবন্ত দেবতা! আজ যে তুমি তোমার প্রিয় পুত্রকে আমাদের নিকট হইতে সরাইয়া লইলে, তাঁহাকে তো তুমি তোমার ঐ আনন্দময় অমৃতময় ধামে চিরবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছ। তোমার নন্দনকাননের কল্পতরুমূলে তাঁহার সাধনবেদী তো নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছ। কিন্তু আজ আমাদের যে একটা শূন্যতা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা আর কে পূরণ করিয়া দিবে? হৃদয়ে অনন্ত শক্তি, বাহুতে অসীম বল লইয়া যিনি মনুষ্যের উদ্ধারব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে তো টানিয়া নিলে। দয়াময়! আজ আমাদের এই নিরাশ প্রাণে, আজ আমাদের এই শোককাতর হৃদয়ে তুমি আশার আলোক জ্বালিয়া দাও। দুর্ব্বল প্রাণে বলসঞ্চার কর। আজ যে ভক্ত মহাজন অনন্ত সংসারসমুদ্রের তীরে তাঁহার পদচিহ্ন রাখিয়া গেলেন, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, দেব! আমরা যেন সেই চিহ্ন ধরিয়া গন্তব্য পথে উপনীত হইতে পারি। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায় সংসারবৃক্ষে যে অমৃত ফল ফলিয়াছে, আমরা যেন তাহা আস্বাদন করিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারি। তাঁহার উপদেশ, তাঁহার মধুময় বাক্য এখনও আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। হৃদয়ে বল দাও দেব! যেন আমরা সে উপদেশ, সে বাক্য শুনিয়া চলিতে পারি। করুনাময় পরমেশ! আজ যাঁহাকে তুমি লইয়া গেলে, তাঁহার হৃদয়ে চিরশান্তি, চির

আনন্দ আনিয়া দাও। আজ যে দেব-হৃদয় দেবহৃদয়ে মিশিয়া গেল, সে মিলনে যেন বিচ্ছেদ না ঘটে। হে দেবদেব-পরমদেব! সে দেবপ্রাণকে তুমি আনন্দসুধামৃতে পূর্ণ রাখ, ইহাই আমাদের প্রার্থনা, তুমি তাহা পূর্ণ কর। (১)

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

স্ত্রীলোক ছাত্রী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যে কোন বালিকা গৃহে মানসিক চর্চ্চা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে, স্কুলের পাঠের পর হইতে আবার বই ধরা তার পক্ষে জ্ঞানলাভের অতি উৎকৃষ্ট উপায়। রোজ সকালে ও বৈকালে তিন ঘণ্টা মনোযোগের সহিত পাঠ্য পুস্তক পড়িলেই যথেষ্ট হইবে। আমার মতে দুই তিন বোন, কিম্বা ননদ, ভাজ এক সঙ্গে পড়িলে বেশী উপকার পাওয়া যায়। উহাতে পরস্পরের সঙ্গে আড়া-আড়িতে মনে অধিক উৎসাহ জন্মে, আর সকলের গুণের সমতুলনা বশতঃ কেহ আত্মম্ভরী হইতে পারে না। কোন ব্যক্তিকে নিজের চেয়ে অধিকতর বুদ্ধিমান্ বা চতুর দেখিলে আমরা আত্মশ্লাঘা করিতে বিরত হই, উহা দ্বারা আমাদের দুইটী মহামঙ্গল সাধিত হয়। একটী—উহা আমাদিগকে অহঙ্কার ভুলিতে ও পরিশ্রম করিতে শিখায়, অপরটী—লোহা যেমন লোহাকে তীক্ষ্ণ করে, তেমনি মানুষের সঙ্গ মানুষকে চালাক করে।

হিন্দু পরিবারের মহিলাদের পক্ষে নিয়মিতরূপে লেখাপড়া বা নিজের উন্নতি সাধন করা অসাধ্য, এরূপ ভাবিয়া যদি কোন পাঠিকা আত্মোন্নতিচর্চ্চার অবহেলা করেন, আমি তাঁর সেই ভ্রমসংস্কারটা দূর করিবার জন্য নীচে আমাদের বাল্যকালের একটী প্রকৃত ঘটনা লিখিতেছি। আশা করি উহা পড়িয়া অনেকেরই সাহস বাড়িবে। বিবাহের পর আমরা পাঁচ ছয় জন যা ও ননদ একত্র হইয়া লেখাপড়া করিতাম। সেই আড়া-আড়িতে আমাদের শিক্ষার যে কত দ্রুত উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। আরো, আমরা নিজ নিজ মানসিক কর্ষণের আশয়ে সকলে মিলিয়া একটা সভা করিয়াছিলাম। আমাদের সেই ক্ষুদ্র সমিতিটীর নাম দশ বার জন স্ত্রীলোক ব্যতীত আর কেহ শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু বাল্য-কালের সেই সামান্য সভার প্রসাদেই আমি বোধ হয় এখন পাঠিকাদের সঙ্গে

(১) ভক্তিভাজন স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের এই জীবনী তাঁহার প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের সময় আমাদের হস্তগত হয়। কিন্তু সে সময় স্থানাভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণে লেখকের বিশেষ অনুরোধে ইহা প্রকাশিত হইল।

আলাপ করিতে পারিতেছি। পরস্পরের মানসিক উন্নতিই আমাদের সভার উদ্দেশ্য ছিল। প্রতি রবিবারে বিকালে সভা বসিত, আমাদের মধ্যেই এক এক জন সভ্য পালাক্রমে বক্তৃতা করিতেন। বক্তৃতাটা সচরাচর প্রবন্ধের ন্যায় লেখা হইত, কখন কখন কেহ বা দুই চারিটা কথা মুখে মুখেও বলিতেন। বক্তৃতার পরে তর্ক উঠিত, তর্কের পর দুই ঘণ্টা ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে আলোচনা হইত; মাঝে মাঝে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে সঙ্গীতও গাওয়া হইত। আমাদিগের জীবনের প্রারম্ভে এইরূপ সুযোগ পাইতে দেখিয়া পাঠিকারা হয়ত মনে করিবেন, আমরা নিশ্চয়ই বড় ভাগ্যবতী ছিলাম। কিন্তু তাহা নহে। আমাদের ভাগ্য আপনাদের অপেক্ষা বেশী জলজলে ছিল না। তবে আমরা নিয়তিকে জয় করিতে সংকল্প করিয়াছিলাম, এবং উহাতে অনেকটা সফলও হইয়াছিলাম।

আমরা একটা হিন্দু পরিবারের অবরুদ্ধা বৌ-মেয়ে ছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বিবাহের পর আমরা লেখাপড়া ছাড়িয়া দিই নাই, বরং স্বামী ও ভ্রাতাদের উৎসাহে অধিক মনোযোগের সহিত বিদ্যা অর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হই। ক্রমে আমাদের সেই শিক্ষাপ্রিয়তা আমাদিগকে অধিক উচ্চ জ্ঞানের পথে আহ্বান করে। আমরা জ্ঞানের সেই প্রবল তৃষ্ণায় চঞ্চল হইয়া যেরূপ সাধ্য স্ব স্ব জীবনকে অধিকতর প্রশস্ত করিতে কৃতসংকল্প হই। আমাদের সভা সেই প্রতিজ্ঞার ফল। অন্তঃপুরের একটা নির্জ্জন ঘর আমাদের সভাগৃহ হইয়াছিল। আর তখন আমরা সকলেই ১৫।১৬বৎসরের বালিকা হইলেও দুই তিন জনকে জননীর কর্ত্তব্যে বিব্রত থাকিতে হইত। তাহা ব্যতীত অনেক দাস দাসী সত্ত্বেও আমরা নিজেই অনেক গৃহকর্ম্ম দেখা শুনা করিতাম। কিন্তু, ইচ্ছা যেখানে, উপায় সেইখানে। এ সকল গোলমালের মধ্যে থাকিয়াও আমরা এক বৎসর কাল নিয়মিতরূপে সভার কাজ চালাই। সকাল সকাল সমস্ত কাজ কর্ম্ম সারিয়া, ছেলেদিগকে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিয়া, বেলা ৪টার সময় আমরা সভায় বসিতাম। সামাজিক, সাংসারিক বা নৈতিক বিষয় লইয়াই বক্তৃতা ও আন্দোলন হইত। আর উহা দ্বারা আমরা পরস্পরের দোষ-সংশোধনেরও চেষ্টা পাইতাম। তিন ঘণ্টা আলাপাদির পর ৭টার সময় সভাভঙ্গ হইত।

এক দিন আমরা ঐরূপ গুপ্ত সভায় ব্যাপৃত আছি, একজন সভ্য বেশ বক্তৃতা করিতেছেন, মাঝে মাঝে হাততালি ও ভেরী-গুড়ের বটা চলিতেছে, এমন সময় সভাগৃহে আমাদের শাশুড়ী ঠাকুরাণী আসিয়া উপস্থিত। তিনি প্রতি রবিবারে আমাদের এমন চুপচাপে একত্র সমাবেশ দেখিয়া বোধ হয় বড় কৌতূহলী হইয়াছিলেন, আর সে দিন ঘটনাক্রমে আমরা ঘরের দরজায় হুড়্কা দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অবশ্য তাঁহাকে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত লজ্জিত

হইলাম, বক্তা তাঁর কাগজ পত্র লুকাইলেন, সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু তিনি আমাদের আচরণে বিরক্তির পরিবর্ত্তে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন ও আমাদের সভার একজন সভ্য হইতে চাহিলেন। আমরাও সানন্দে তাঁহাকে সভাপতি করিলাম। আমাদের শাশুড়ী ঠাকুরাণীর ন্যায় ওরূপ অমায়িক মা বা শাশুড়ী পাওয়া সকলের ভাগ্যে না ঘটিতে পারে, কিন্তু নিয়মিতরূপে সংসারের কাজ সারিয়া প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা লেখাপড়ার সময় দিলে কোন শাশুড়ীই অসন্তুষ্ট হইতে পারেন না। বিশেষতঃ, মেয়েবৌদের শিক্ষিতা দেখিতে আজ কাল সকল মা ও শাশুড়ীদিগকে উৎসুক দেখা যায়।

আমরা যে কোন জ্ঞান লাভ করি, তাহা জীবনে কখন না কখন প্রয়োজনে লাগেই। সুতরাং যে দিক্ দিয়ে ও যেরূপেই হউক্, জ্ঞানসঞ্চয় করা মানুষের প্রধান কাজ। জ্ঞানবুদ্ধিতেই মানুষ পশুর অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানবুদ্ধির কর্ষণের দ্বারা আমরা যতই আত্মোন্নতি করিতে পারি, ততই আমরা ইতর জীব হইতে দূরে আসি। সভ্যতাই বল, আর ক্ষমতাই বল, সে সবই জ্ঞান হইতে উৎপন্ন। সে জন্য আমাদের জীবনে যত দিন ঐ জ্ঞানের অভাব থাকিবে, ততদিন আমরা নিরুপায় ও হীনবল থাকিব। কিন্তু শুধু অনেক পুস্তক পড়িলেই জ্ঞান পাওয়া যায় না, ভাল বই পড়িয়া তার সারটুকু হৃদয়ঙ্গম করাই প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের উপায়। তাই আবার বলি, আমাদের এই সংকীর্ণ জীবনে উত্তম সারগ্রন্থ পড়িয়া মনকে প্রশস্ত করাই আমাদের উন্নতির একমাত্র ভরসা। এ কর্ত্তব্যে কোন বঙ্গনারী যেন অবহেলা না করেন, এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

জ্ঞানোপার্জ্জনের আশায় পুস্তক পড়িলে, কোন বই যে রকমে হোক পড়িয়া তাড়াতাড়িতে শেষ করিলে চলিবে না। পুস্তকের প্রতি পদ, প্রতি পৃষ্ঠা, অতি ধীরে ধীরে পড়িয়া তার ঠিক্ অর্থ গ্রহন করিতে চেষ্টা করিবে। প্রথম বারে যদি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পার, তাহা হইলে দ্বিতীয় বার পড়িবে; সে বারেও যদি উহার ভাব বুঝিতে না পার, তবে আবার পড়িবে। এইরূপে যত দিন না সমস্ত বইখানি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, ততদিন উহা ছাড়িয়া নূতন পুস্তক ধরিবে না। মানুষ লাফিয়ে কখনও একবারে তেতালায় উঠিতে পারে না, এক এক পা করিয়া সিঁড়ি উঠিতে হয়, এবং সিঁড়িতে উঠিবার কালে সতর্ক হইয়া না উঠিলে পা সরিয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়টি যেন কেহ বিস্মৃত না হন। পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে সরল জীবনচরিত পড়িলেও মহা উপকার পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট কার্য্যক্ষম ও মহাশয় লোকদের জীবনী দেখিয়া আমাদের মন অধিকতর দৃঢ় ও উৎসাহী হয়। আর আমরাও তাঁদের মত ধীরভাবে পরিশ্রম করিতে শিখি। পাঠকালে কথার মানে জানিবার বা কঠিন বিষয় সকল বুঝিবার জন্য যদি

কাছে অভিধান না থাকে, তাহা হইলে সকল কথা ও পদগুলি একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিবে; পরে সময়মত স্বামী, ভ্রাতা বা অন্য কোন আত্মীয়ের নিকট বুঝাইয়া লইবে। আজ কাল হিন্দু-পরিবারের মধ্যে এরূপ যুবক বা বালক অতি অল্পই দেখা যায়, যাহারা স্ত্রী ও ভগিনীদের লেখা পড়ায় যত্ন দেখিলে আনন্দিত না হয়, বা উৎসাহের সঙ্গে সাহায্য না করে। যে বালিকা বা স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী বা কোন আত্মীয়ের নিকট রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা করেন, তাঁর ওরূপ না করিলেও চলে, কিন্তু যাঁরা সদয় ভাই বা স্বামীর যত্নে বঞ্চিত ও শিক্ষয়িত্রী রাখিতে অপারগ, তাঁহাদের জন্যই আমি এই শিক্ষাব্যবস্থাটী লিখিলাম। আর আজকাল অনেক পুরুষ পরিবারস্থ স্ত্রীলোক-দিগকে সুশিক্ষিতা দেখিতে ইচ্ছুক হইলেও তাহাদিগকে নিজেরা শিক্ষা দিতে অক্ষম। এরূপ স্থলে নারীরা যদি আপন যত্নেই তাঁহাদের যোগ্য ভগিনী ও পত্নী হইতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহারা কতই সুখী হইবেন। আর বঙ্গবালার জীবনে কি মধুময় নূতন আলোক ফুটিয়া উঠিবে।

আব্রাহাম্ লিন্‌কন্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(২)

জননীর মৃত্যুর পর হইতে আব্রাহাম্ লিন্‌কন্‌কে পূর্ব্ববৎ প্রফুল্ল দেখা যাইত না। অধিকাংশ সময়ই তিনি বিমর্ষ থাকিতেন। কিন্তু এত দুঃখের সময়ও তিনি আপনার কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হন নাই। মনে প্রফুল্লতা না থাকিলেও সাংসারিক কার্য্যে কিম্বা পুস্তক অধ্যয়নে কেহ তাঁহাকে অমনোযোগী দেখে নাই। তাঁহার পিতা টমাস পত্নীবিয়োগের পর হইতে বিষাদে কালযাপন করিতেন। মাতার মৃত্যুর পর হইতে কন্যা থারা সমুদায় গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি বালিকা ছিলেন; সুতরাং গৃহকর্ম্মে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল না। কিয়দ্দিবসের মধ্যে লিন্‌কন্-পরিবারে বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হইল। সংসারে সুশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য টমাস লিন্‌কন্ পুনরায় বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেণ্টকির অন্তর্ভূত এলিজাবেথ টাউনে জন্‌সন্ নামক কোনও এক ব্যক্তির বিধবা বাস করিতেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর টমাস এলিজাবেথ টাউনে ভ্রমণার্থ গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি উক্ত জন্‌সনের বিধবার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। বিধবাটীর একটী পুত্র এবং দুইটী কন্যা ছিল। বিবাহের পর নবপরিণীতা ভার্য্যা ও তাঁহার পুত্র-কন্যাগণ সমভিব্যাহারে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন

করিলেন এবং তাঁহার সেই একমাত্র কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। আব্রাহাম্ নূতন জননী প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ের শোকাগ্নি কতক পরিমাণে প্রশমিত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আবার ধীরে ধীরে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইণ্ডিয়ানায় আগমনের সময় টমাসের নবপরিণীতা সহধর্ম্মিণী নানাবিধ মূল্যবান্ সামগ্রী ও অনেক গৃহসজ্জা আনয়ন করিয়াছিলেন। এইখানে কালে ডেনিস্ হাঙ্কস্ ও এলেন হল নামক দুইটী যুবকের সহিত জননের কন্যাদ্বয়ের বিবাহ হইয়াছিল।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতে বিমাতারা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হইয়া থাকেন, কিন্তু আব্রাহামের বিমাতা বাস্তবিকই দেবীস্বরূপিণী ছিলেন। তাঁহার সুব্যবস্থাগুণে লিন্কন্-পরিবারে আবার সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। আব্রাহামকে তিনি প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন; লিন্কন্-পরিবারে প্রবিষ্ট হইয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আব্রাহাম একজন সামান্য বালক নহেন। বালকের অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে তিনি বিস্মিতা হইয়াছিলেন। পুত্রের জ্ঞান-পিপাসা দেখিয়া জননী সর্ব্বদাই তাঁহাকে উৎসাহ দান করিতেন। আব্রাহামের জননীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, আব্রাহাম ভবিষ্যতে যুক্তরাজ্যমধ্যে কোনও উচ্চ পদ লাভ করিয়া দেশের অনেক উপকার সাধন করিবেন। টমাস ও তাঁহার প্রথমা স্ত্রী আব্রাহামকে অসীম স্নেহে ও যত্নে প্রতিপালন করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পুত্রের প্রতিভা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া তাঁহাকে অধ্যয়নে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতে পারেন নাই। টমাস লিন্কনের গৃহে তিনখানি মাত্র পুস্তক ছিল। আব্রাহামের নূতন জননী "The Pilgrim's Progress ও Æsop's Fables" নামক দুই খানি পুস্তক পুত্রকে দিয়াছিলেন। আব্রাহাম লিন্কন্ এই নূতন গ্রন্থ দুইখানি প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। যাঁহাদের পুস্তকপাঠের ইচ্ছা সর্ব্বদাই বলবতী থাকে, তাঁহাদের যে পুস্তকপ্রাপ্তিতে বিশেষ আনন্দ হয়, এ কথা বলা বাহুল্য। আব্রাহামের বিমাতা শিক্ষিতা ছিলেন। তিনি পুত্রকে নিজ সামর্থ্যানুসারে পুস্তক পাঠ করাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ নীতিশিক্ষা দান করিতেন। আব্রাহাম্ লিন্কন্ শৈশবেই তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা জননীর নিকট হইতে ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই শিক্ষাই তাঁহাকে উত্তরকালে সুখ দুঃখ সকল অবস্থায় ভগবানের উপর নির্ভর করিতে সক্ষম করিয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় ইণ্ডিয়ানায় কোনও বিদ্যালয় ছিল না। কিন্তু আব্রাহাম লিন্কনের জননীর যত্নে তথায় একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি আব্রাহামকে

বিদ্যাশিক্ষার্থ তথায় প্রেরণ করিলেন। জননী পুত্রের বিদ্যালয়গমনের উপযোগী একটী পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পর আব্রাহামের উৎসাহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। জননীর সাহায্যে তিনি গৃহে পাঠ সমাধা করিতেন। পিতা একখানি গণিত পুস্তক ক্রয় করিয়া দিলেন। আব্রাহাম লিন্‌কন্ আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পরিচালনা দ্বারা অতি অল্প দিবসের মধ্যেই বিদ্যালয়ে একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ডর্সি (Dorsey) তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। নানা কারণে শীঘ্রই বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ পাইল। আব্রাহাম গৃহে জননীর নিকট অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার জননীও সাতিশয় যত্নের সহিত তাঁহাকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন।

১৮২৩ খৃঃ অঃ স্পেন্সার প্রদেশবাসী এণ্ড্রু ক্রফোর্ড (Andrew Crawford) নামক এক ব্যক্তি শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া পুরাতন বিদ্যালয়গৃহে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। ক্রফোর্ড একজন বিশেষ শিক্ষিত লোক ছিলেন। নূতন শিক্ষকের সমাগমের সঙ্গে আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ পুনর্ব্বার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গুণে বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত এবং সম্মান করিত। ছাত্রদিগের মধ্যে কোনও রূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি সুন্দররূপে তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। এক দিন বিদ্যালয়ে ছুটীর পর বাড়ী যাইবার সময় দুইটী বালকের মধ্যে এক বানান লইয়া মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। বানানটী দুই জনেরই ভুল হইয়াছিল। প্রথমতঃ গালাগালি হইতে আরম্ভ হইয়া শেষে দুইজনের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হইল। এই বিবাদের পরিণাম অশুভ দেখিয়া আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ উভয়কে মিষ্টবাক্যে নিবৃত্ত করিলেন। বিদ্যালয়ের মধ্যে তিনিই বিদ্যায় সর্ব্বপ্রধান ছাত্র ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কথায় দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইল। ছাত্র দুইটী আপন আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বিশেষ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইল এবং ভবিষ্যতে আর কখনও বিবাদ করিবে না বলিয়া আব্রাহামের নিকট অঙ্গীকার করিল। প্রতিভাশালী ছাত্র পাইলে তাহাকেই সমধিক যত্নে ও পরিশ্রমে শিক্ষাদান করিতে স্বভাবতই শিক্ষকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। মিষ্টার ক্রফোর্ড আব্রাহাম্ লিন্‌কন্‌কে ছাত্র স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। পুস্তকপাঠের সঙ্গে ছাত্রগণ যাহাতে সদাচারী ও চরিত্রবান্ হয়, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে প্রায়ই ভদ্রজনোচিত আচার ব্যবহার ও চরিত্রগঠন সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিতেন। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশগুলি যত্নের সহিত শ্রবণ করিতেন। আব্রাহাম্ কেবল

উত্তমরূপ পাঠ বলিতে পারিতেন বলিয়াই যে শিক্ষকের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার সত্যবাদিতা দর্শনে শিক্ষক মহাশয় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বালকেরা কোনও অপরাধ করিলে তাহা গুরুজনের নিকট গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। আব্রাহাম্ লিন্‌কনের কিন্তু সেরূপ প্রকৃতি ছিল না। কোনও অন্যায় কার্য্য করিলে তিনি তাহা গোপন করিতে চেষ্টা না করিয়া মুক্তকণ্ঠে গুরুজনের নিকট স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। একদিন আব্রাহাম্ অসাবধানতাবশতঃ বিদ্যালয়ের দেওয়ালস্থিত একটী মহিষের শিং ভাঙ্গিয়া ফেলেন। শিক্ষক এনফোর্ড বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলে, সত্যবাদী আব্রাহাম্ নির্ভয়চিত্তে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় দোষ জ্ঞাপন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার এই ব্যবহার দর্শনে শিক্ষকমহাশয় বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং অসাবধানতা-জনিত তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

বিদ্যালয়ে প্রবেশের কিয়ৎ দিবস পর হইতেই আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতে অভ্যাস করেন। তাঁহার "প্রাণীদিগের প্রতি দয়া" শীর্ষক প্রবন্ধটী বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি সর্ব্বজীবে সমভাবে দয়া করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ যদি কখনও কোন জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহাদিগকে সেই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে যত্নবান্ হইতেন। একদিন তাঁহার কতিপয় বন্ধু একটী কূর্ম্মকে দ্রুত গমনের জন্য নানারূপ যন্ত্রণা দিয়া কৌতুক করিতেছিলেন। আব্রাহাম্ ইহা দেখিয়া, তাঁহার বন্ধুগণকে সেই নিষ্ঠুর আমোদ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। শেষে আব্রাহাম্ বাধ্য হইয়া বলপ্রয়োগে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে তাঁহার বন্ধুবর্গের হস্তে বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাঁহাদের দুর্ব্ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত হন নাই। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ সর্ব্ব জীবে সমভাবে দয়া প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ভগবান্‌ও তাঁহার এই সৎশিক্ষার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিয়াছিলেন।

"জীবে প্রেম স্বার্থত্যাগ, ভক্তি নারায়ণে।
সকল শিক্ষার সার রাখিও স্মরণে॥"

আব্রাহাম্ লিন্‌কনের জীবনের এই ঘটনাটী উক্ত পংক্তি দুইটীর সার্থকতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ কেবল বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না; তিনি অন্যান্য পুস্তকও সংগ্রহ করিয়া অতিশয় যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিতেন। জর্জ ওয়াসিংটনের নাম সভ্য জাতিমাত্রেরই নিকট পরিচিত।

আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ এই মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্থাভাব হেতু পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করা তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। ওয়াসিংটন কি উপায়ে যুক্তরাজ্যের সভাপতির আসন গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন, কি প্রণালীতে আপন মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয় অবগত হইবার জন্য লিন্‌কনের বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে. তাঁহার প্রতিবেশী যোশিয়া ক্রফোর্ডের নিকট জর্জ্জ ওয়াসিংটনের জীবনচরিত পুস্তক আছে। তিনি ক্রফোর্ডের নিকট গমন করিয়া কয়েক দিবসের জন্য পুস্তকখানি প্রার্থনা করিলেন। ক্রফোর্ডের নিকট তিনি এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুস্তকখানি অতিশয় যত্নের সহিত রক্ষিত হইবে, তাহার কোনও অংশ নষ্ট হইবে না। যোশিয়া ক্রফোর্ড আব্রাহাম্ লিন্‌কনের জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া তাঁহাকে পুস্তকখানি অধ্যয়ন করিতে দিলেন। আব্রাহাম্ আগ্রহের সহিত বীরবর জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জীবনচরিত আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি যতই ওয়াশিংটনের জীবনের ঘটনাবলী অবগত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে নৈতিক বলের এবং সাহসের সঞ্চার হইতে লাগিল এবং উত্তর কালে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের সমকক্ষ হইবার বাসনা জন্মিল। পুস্তকের কোনও অংশ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইলে তাঁহার জননীই তাহা তাঁহাকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতেন। একদিন আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ পাঠাবসানে রাত্রে পুস্তকখানি এক স্থানে রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন এবং পর দিবস প্রাতে নিদ্রাবসানে দেখিলেন যে, পুস্তকখানি কোনও প্রকারে সলিলসিক্ত হইয়া একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ভাবনাস্রোত প্রবাহিত হইল। তাঁহার পিতার এরূপ সঙ্গতি ছিল না যে, তিনি ক্ষতিপূরণের জন্য মিষ্টার ক্রফোর্ডকে একখানি নূতন পুস্তক ক্রয় করিয়া দেন। কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে ক্রফোর্ডকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন, লিন্‌কন্ তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রফোর্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। অবশেষে ক্ষতিপূরণের জন্য তিনি এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি তাঁহার পুস্তকদাতার নিকট গমন করিলেন এবং স্বীয় দোষ জ্ঞাপন পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে, তিনি শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা তাঁহার ক্ষতি পূরণ করিতে প্রস্তুত আছেন। যোশিয়া ক্রফোর্ড একটু বিরক্তির সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি আব্রাহাম্ লিন্‌কনকে নিজ শস্যক্ষেত্রে মজুরের ন্যায় কার্য্য করিতে অনুমতি করিলেন। আব্রাহাম্ হৃষ্টচিত্তে ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত

হইলেন এবং পাঁচ দিবসের কার্য্য তিন দিবসেই শেষ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই কার্য্য দেখিয়া ইণ্ডিয়ানার অধিবাসিগণ তাঁহার প্রতি একান্ত প্রীত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল। এই কার্য্যকালে একদিন ক্রফোর্ডের সহধর্ম্মিণী আব্রাহামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভবিষ্যতে তুমি কোন্ পদ পাইবার আশা কর।" প্রত্যুত্তরে আব্রাহাম্ ক্ষণবিলম্ব না করিয়াই বলিয়াছিলেন, "যুক্তরাজ্যের সভাপতির (President) পদ।" ক্রফোর্ডের পত্নী বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। বাল্যকাল হইতে আব্রাহাম্ হৃদয়ে উচ্চ আশা পোষণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহার সে আশা সফলও হইয়াছিল।

"Pitch thy behaviour low, thy projects high,
So shall thou humble and magnanimous be.
Sink not in spirit, who aimeth at the sky
Shoots higher much than he who means a tree."

আব্রাহাম্ লিন্‌কনের জীবনচরিত পাঠ করিলে জর্জ্জ হার্ব্বার্ট (George Herbert) লিখিত উল্লিখিত পংক্তি কয়টীর প্রত্যেক শব্দের সার্থকতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

আব্রাহামের বিদ্যানুরাগের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সদ্‌গ্রন্থ পাঠের ন্যায়, সুবক্তৃতা শ্রবণেও তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ ছিল। যেখানে খ্যাতনামা বক্তাগণ বক্তৃতা করিতেন, আব্রাহাম্ সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল। তিনি একবার যাহা শ্রবণ করিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। সভাস্থল পরিত্যাগ করিবার পর তিনি বক্তাগণের বক্তৃতার সারাংশ সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে শত শত উচ্চ আশার সহিত, সুবক্তা হইবার আশাও অঙ্কুরিত হইয়াছিল; এবং এই জন্যই উত্তরকালে তিনি যুক্তরাজ্য-মধ্যে একজন সুবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথনাথ বসু।

বিসূচিকা বা ওলাউঠা রোগ।

অথ বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকা নিদান।

বিসূচী রোগকে Cholera বা ওলাউঠা, অলসককে Tympanytis বা তলপেট-ফাঁপা, আর বিলম্বিকাকে Constipation বা কোষ্ঠবদ্ধ কহে।

যে রোগে অজীর্ণ হেতু বায়ু সূচী-বিদ্ধনের ন্যায় শরীরকে ব্যথিত করিয়া অবস্থিতি করে, তাহাকে বিসূচী কহে। বিসূচিকা রোগে উদরে শূল হইয়া অতিশয় মলরেচন ও বমন হইতে থাকে। রোগীর দাহ, পিপাসা, বক্ষঃস্থলে এবং মস্তকে বেদনা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, কম্প ও জৃম্ভণ হয় এবং শরীর বিবর্ণ হইয়া হস্তপদাদিতে খাল ধরে। (নিদান)। অজীর্ণ প্রযুক্ত সূচী কর্তৃক গাত্র-বিদ্ধ হওনের ন্যায় বায়ু জন্য যাতনা হইলে বিসূচিকা বলা যায় (সুশ্রুত)।

অলসক রোগে অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ হয়, বাত-কর্ম্ম রুদ্ধ হইয়া আধ্মান উৎপন্ন হয় এবং বায়ু ঊর্দ্ধগত হইয়া কুক্ষির উপরে কণ্ঠ পর্য্যন্ত গমন করে, রোগী তৃষ্ণা ও উদ্গার জন্য পীড়িত হয় এবং অতিশয় কষ্ট হেতু আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। (নিদান)

মূর্চ্ছা, অতিসার, বমন, পিপাসা. শূল, ভ্রম, উদ্বেষ্টন, জৃম্ভণ, দাহ, বিবর্ণতা কম্প, হৃদয়ে বেদনা, শিরোবেদনা, কুক্ষিদেশের আনদ্ধ ভাব (টেনে থাকা), আচ্ছন্ন প্রায় কূজন (গোঁ গোঁ শব্দ), বায়ু রুদ্ধ হইয়া কুক্ষিদেশে ধাবিত হওন এবং বায়ু পুরীষের কুক্ষিদেশে নিরোধ, হিক্কা এবং উদ্গার এই সকল লক্ষণ হইলে অলসক বলা যায়। (সুশ্রুত)

যে রোগে কফ এবং বায়ু কর্তৃক আহার দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধ অথবা অধোদ্বারা নির্গত না হয়, তাহাকে প্রাচীন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা বিলম্বিকা কহে। এই ব্যাধি অতিমাত্র দুশ্চিকিৎস্য। (নিদান)

ভুক্তদ্রব্য কফ ও বায়ু কর্তৃক দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধ বা অধোভাগে প্রবর্ত্তিত না হইলে বিলম্বিকা রোগ বলা যায়। ইহা চিকিৎসকের অসাধ্য। (সুশ্রুত)

যে বিসূচী এবং অলসকগ্রস্ত রোগীর দন্ত, ওষ্ঠ ও নখ শ্যামবর্ণ হয়, মূর্চ্ছা, মোহ, বমন, ক্ষীণ স্বর, ও সন্ধিসমূহ শিথিল হয় এবং চক্ষুর্দ্বয় কোটরে প্রবেশ করে, সে ব্যক্তির মৃত্যু হইবে। (নিদান)

দন্ত, ওষ্ঠ, নখ শ্যামবর্ণ, অল্প সংজ্ঞা, বমন, নেত্রকোষ মগ্ন (চক্ষু খোলে বসিয়া যাওয়া), স্বরের ক্ষীণতা এবং সন্ধির শৈথিল্য, এইগুলি ঘটিলে বিসূচিকা রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। এই লক্ষণ গুলি ঘটিলে রোগীকে কদাচই বাঁচিতে দেখা যায় না। (সুশ্রুত)

Cholera বা ওলাউঠা।

ইহা সার্ব্বভৌমিক (Epidemic) ও শীঘ্র শীঘ্র মারাত্মক।

বিশেষলক্ষণ—জলীয় ভেদ; প্রস্রাব বন্ধ, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্রাব বন্ধ; টীসু (Tissue) সব ভিতর দিকে যাওয়া; খাল ধরা; এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়া।

লক্ষণ ও গতি—বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে এ রোগ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন ১৮১৭ অব্দে যশোহরে ইহা প্রথম দেখা দেয়। কেহ বা বলেন, মিশর দেশে ডেল্‌টাতে প্রথম দেখা যায়, ক্রমে ক্রমে বর্ম্মা, চায়না, তাতার ও রুসিয়া দিয়া ইউরোপে যায়। হাম্বার্গে তিন বৎসরে ৩০০০ লোকের মৃত্যু হয়।

ওলাউঠার প্রথম, দ্বিতীয় বারের মল তত দূষিত নয়, কিন্তু তৃতীয়, চতুর্থ বারের অর্থাৎ শেষ অবস্থায় ও হিমাঙ্গ অবস্থায় যে মলত্যাগ হয়, তাহা অত্যন্ত দূষিত হয়।

সাধারণতঃ এ রোগের গুপ্তাবস্থার ঠিক নাই, কয়েক ঘণ্টা হইতে তিন দিনের ভিতরে হয়।

রোগের আরম্ভ—প্রথম কাণে ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়; শরীর নিস্তেজ হয়; দুর্ব্বল হয়; অসুস্থ বোধ হয়। পরে উদরাময় হয়। এই প্রকার অবস্থা কয়েক ঘণ্টা থাকে অথবা দুই এক দিনও থাকে, পরে হঠাৎ যথার্থ ওলাউঠার চিহ্ন প্রকাশ পায়; ঘন ঘন মলত্যাগ হয়। প্রথমে মলে পিত্ত থাকে, পরে মল তরল হয়; সাদা মল হয়; রংহীন হয়, গন্ধহীন হয়, কেবল সাদা সাদা চর্ব্বির মত পদার্থ মলের উপর ভেসে থাকে। ভেদ অধিক পরিমাণে হয়, এমন কি ৪।৫ পাইণ্ট ভেদ হয়।

প্রথম উদরাময় হয়, পরে বমনেচ্ছা ও বমি হয়। প্রথমকার বমিতে পাকাশয়ে ও অন্ত্রে (Duodenum) যাহা থাকে, তাহা বাহির হয়। ভেদ বা বমির পর খাল (Cramp) ধরিতে থাকে। খাল উরুদেশে, পায়ের পিছনে, বাহুতে, হাতে ও তলপেটের আবরণে ধরে। প্রথমে ভেদ হয়, পরে বমি হয়, শেষে খাল ধরে। এ প্রকার অবস্থার পর হিমাঙ্গ অবস্থা (Collapse) হয়; এ অবস্থায় টীসু (Tissue) সমস্ত ভিতর দিকে যায়, কুঁকড়ে যায়, হাত পায়ের আঙ্গুল চুপ্‌সে যায়; চক্ষু গর্ত্তে প্রবেশ করে; চক্ষুর চারিদিক্ কাল বা নীলবর্ণ হইয়া যায়। রক্তহীনতার চিহ্ন হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বয় এবং মৃদু (Shallow) হয়, স্বরভঙ্গ হয়, রোগী আস্তে আস্তে কথা কয়; দুর্ব্বল হয়। নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত, দুর্ব্বল অথচ সূতার মত হয়। কখন কখন নাড়ী পাওয়া যায় না; যদি পাওয়া যায়? তবে মণিবন্ধে (Wrist) না পাইয়া Brachial artery-তে (ব্রেকিয়াল ধমনী) পাওয়া যায়।

উত্তাপের বিষয় (Temperature)— উত্তাপ কমে যায়, ৯৫, ৯৪, ৯২ ডিগ্রী কিম্বা ইহা অপেক্ষাও কম হইতে পারে। মুখের, বগলের ও অন্যান্য স্থানের উত্তাপ কমিয়া যায়, কিন্তু মলদ্বারের (Rectum) উত্তাপ অধিক থাকে, ১০১, ১০২, ১০৪ ডিগ্রী থাকিতে পারে। ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম হয়; জিহ্বা ও শ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায়; প্রস্রাব ও পিত্তনিঃসরণকার্য্য বন্ধ হয়। রোগীর নিদ্রা হয় না, এপাশ ওপাশ করে, হাত পা ছোঁড়ে। অত্যন্ত পিপাসা হয়; বুক জ্বালা করে; রোগী অমনোযোগী হয়, হাত এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখে। এই সমস্ত চিহ্ন দেখা দিলে হিমাঙ্গ অবস্থা (Collapse stage) হইয়াছে ভাবিবে।

তখন ভেদ ও বমি একেবারে বন্ধ হইয়া যায় অথবা কমিয়া আসে। রোগী

মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে ; মাংসপেশীর কার্য্য একেবারে দুর্ব্বল হয় ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রোগীর বুদ্ধিবৃত্তি ঠিক থাকে। কখনও এ অবস্থায় রোগী বিছানায় উঠে বসে।

এ প্রকার হিমাঙ্গ অবস্থা ২।৩ ঘণ্টা হইতে ৩০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে, অথবা আরো অধিকক্ষণ থাকিতে পারে ; পরে (১) মৃত্যু হইতে পারে ; (২) Secondery fever (জ্বর) হইতে পারে ; (৩) ভাল হইয়া যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে থাল ধরে না ; কাহার কাহার বা অত্যন্ত থাল ধরে ; অত্যন্ত কষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। রাজা শিববক্স বগলার বিধবা-রাণী পরলোকগমনকালে কয়েক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ঐ টাকায় একটী হাঁসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের একটী প্রকোষ্ঠ, ঘুসুড়ীতে একটী স্নানের ঘাট এবং ভুবনেশ্বরে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিতে বলিয়া গিয়াছেন।

২। বরোদার মহারাজ সস্ত্রীক জাপানে গিয়াছেন। জাপান সম্রাটের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে। জাপানবাসীর অভ্যর্থনায় মহারাজ প্রীত হইয়াছেন।

৩। ইংরাজী ভাষায় একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চন্দ ৩রা আষাঢ় শুক্রবার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি মাইকেল্ মধুসূদন দত্তের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

৪। আসাম-বেঙ্গল রেলপথের ৩৩ মাইল পথ জলে ভাসিয়া গিয়াছে ; জল এখনও বাড়িতেছে। দশ বারটী সেতু জল-প্লাবনে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

৫। কাশীর একজন বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী বাবু মতিচাঁদ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া কাশীর মণিকর্ণিকার শ্মশানঘাটের সংস্কার সাধন করিয়াছেন।

৬। ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রতি-নিধি হইয়া তিন জন ভারতবাসী বার্লিন নগরে গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র, নববিধান সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত প্রমথ লাল সেন ও সিন্ধু-দেশ হইতে শ্রীযুক্ত ভাসওয়ানী প্রতি-নিধি হইয়া গিয়াছেন।

৭। মান্দ্রাজে সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি-রক্ষার জন্য যক্ষ্মারোগীদের বাসের নিমিত্ত একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করা হইবে।

৮। আগামী ডিসেম্বরমাসে এলাহাবাদে মহামেলা হইবে। ২৮শে ডিসেম্বর হইতে ৩রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ইয়োরোপ হইতে আনীত ২খানি পুষ্পকরথ তদুপলক্ষে আকাশপথে বিচরণ করিবে।

৯। লর্ড ও লেডি মিণ্টো "বেনারস হিন্দুকলেজে" আপনাদের প্রতিমূর্ত্তি প্রেরণ করিয়াছেন। লর্ড মিণ্টোর প্রতি-

মূর্ত্তির নিম্নে লেখা থাকিবে যে, তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রচলনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

১০। বিলাতে বিজ্ঞানবেত্তাগণ একটী অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন্ জীব কোন্ জাতীয়, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহার মধ্যে ঘড়ির দোলকের (Pendulum) ন্যায় একখণ্ড গোলাকার বস্তু আছে; যন্ত্রটীকে পুরুষ-জাতীয় জীবের গাত্রসংস্পর্শ করাইলে ঐ দোলকটী ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে এবং স্ত্রী-গাত্রস্পর্শে উহা ঘড়ির দোলকের ন্যায় দোদুল্যমান হয়। বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য শক্তি! এখন হইতে ছদ্মবেশধারণ আর চলিবে না।

১১। গত ইংরাজী ১৯০৮ সালের ছয় মাস কাল লণ্ডন সহরে ১০,০০০ (দশ সহস্র) শিশুসন্তানকে নিরামিষ আহার করান হইয়াছিল; এবং ঐ সময়ে ঠিক ঐ সংখ্যক শিশুদিগকে আমিষ ভক্ষ্য প্রদত্ত হয়; ফলতঃ ছয় মাস পরে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, নিরামিষাশিগণ আমিষাশী-দিগের অপেক্ষা স্বাস্থ্যবান্, গুরু, দৃঢ়দেহ এবং তাহাদের চর্ম্ম আমিষাহারীদিগের অপেক্ষা পরিষ্কার এক্ষণে লণ্ডনে বহু-সংখ্যক দরিদ্র শিশু, তত্রত্য নিরামিষ-সভা হইতে আহার প্রাপ্ত হইতেছে। মিস্ এফ, আই, নিকোল্‌সন্ এই সভার সম্পাদিকা।

বামারচনা।

আরাধনা।

আমি নির্জ্জনে বসিয়া পূজিব তোমায়,
যেরূপে পরাণ চায়,
আমি চাহিনা'ক কভু বাহিরে দেখাতে,
সেরূপ মাধুরী হায়!
তুমি হৃদয়-দেবতা হৃদয়ে থাকিবে,
উজলি হৃদয়াগার,
আমি দেখিব চাহিয়া অনিমিষ নেত্রে,
বহিবে প্রেমাশ্রুধার।
আমি জানিনা'ক তব স্তবন, পূজন
কেমনে করিতে হয়,
তাই পাগলের মত নিরজনে বসি
বলি যা মনেতে লয়।
আমি দেশ দেশান্তরে চাহিনা খুঁজিতে
তোমারে কখন হায়!
তুমি রয়েছ আমার হৃদয়ে বসিয়া
অন্তরঙ্গ সখা প্রায়॥
যারা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বাহিরে খুঁজিয়ে,
তোমারে দেখিতে চায়,
দেখুক তাহারা সেই ভাবে তোমা,
আমি না দেখিব তায়॥

শ্রীমতী রাজলক্ষী ঘোষ।

চেষ্টা।

তোমারি আলোক ধরিয়া প্রভু হে!
এ হৃদয় ভাঙ্গিয়া গড়িব,
মরমের যত পাপ-মলিনতা
প্রক্ষালিয়া সুদূরে ফেলিব।
ক্লিপ্ত বাসনার সমাধির পাশে
আঁখিজল ফেলিব না আর;
অতীতের সুখ ফিরায়ে আনিতে
করিব না ব্যর্থ হাহাকার।
যাহা দিবে প্রভু! সহিব তাহাই,
দুঃখ-তাপে আর ডরিব না;
ঘৃণা অপমান লাঞ্ছনার ভয়ে
সম্পদের সুখ চাহিব না।
তোমার অনন্ত মহিমা-সঙ্গীত
বিশ্বজনে শুধু শিখাব।
তোমারি নির্দেশ পালিতে নিয়ত
সুখে দুঃখে হৃদি বাঁধিব।
তুমি লও প্রভু! বিষাদ-যাতনা
প্রাণে মম দাও গো শকতি,
মোহ-কুটিলতা-অন্ধকার হ'তে,
দাও মোরে চির অব্যাহতি॥

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

স্বর্গীয়া সুরবালা দাসীর বিয়োগ-সংবাদে শোকোচ্ছ্বাস।

(১)

প্রভাতে উঠিয়া আজি কি শুনিনু হায়!
প্রিয় বৌদিদি আমার নাহি এ ধরায়।
শুনিয়া কঠোর কথা, পরাণে পাইনু ব্যথা,
শেল সম বাজে হৃদে, প্রাণ ফেটে যায়;
আর কিগো! দেখা তুমি দেবে না আমায়?

(২)

সত্যই এ ধরা ত্যজি গেছ তুমি সতী—
পাপশূন্য স্বর্গ-ধামে ওগো পুণ্যবতি!
তুমিতো গো সুরবালা, ত্রিদিবে করিতে খেলা,
সংসারের কুটিলতা সাজে কি তোমারে?
তাই ছেড়ে গেছ তুমি কুটিল সংসারে।

(৩)

ঘোর স্বার্থপর এই সংসার-মাঝারে
এসেছিলে সুরবালা! পরীক্ষার তরে।
মানবের নিষ্ঠুরতা মর্ম্মে তব ছিল গাঁথা,
কত অত্যাচার তুমি সহিয়াছ হায়!
স্মরিলে সে সব স্মৃতি, বুক ফেটে যায়।

(৪)

যাতনায় ভরা ছিল তব হৃদিখানি,
তাই অকালেতে গেলে ওগো দিদিমণি!
সহিতে না পেরে আর, ভব-দুঃখ পারাপার
স্বরগে চলিয়া গেলে আনন্দিত মনে;
আর কি হবে গো দেখা আমাদের সনে?

(৫)

হইবে হইবে দেখা, পুনঃ তব সনে,
কর্ত্তব্য সাধিয়া যবে যাব তব স্থানে।
থাক সেথা সুখে থাক, মম তরে স্থান রেখ

পবিত্র ত্রিদিব-ধাম শান্তির আলয়,
মানবের নিষ্ঠুরতা নাহিক সেথায়।

(৬)

গোলাপ ফুটিয়াছিলে কণ্টক-উদ্যানে,
বিমোহিত হয়েছিল সবে মধুর আঘ্রাণে,
বুকভরা ছিল দুঃখ, তবু ছিল হাঁসি মুখ,
বিষণ্ণ বদন কভু দেখিনি তোমার,
হৃদয়ে রাখিতে চেপে যাতনা অপার।

(৭)

দেখালে সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা তুমি,
তোমার উদ্দেশে দেবি! প্রণমি গো আমি,
ভীষণ সংসারানলে, প্রাণ যবে যেত জ্বলে,
অমনি তোমার কোলে নিতাম আশ্রয়,
স্নেহ-উপদেশ দিয়া তুষিতে আমায়।

(৮)

পাষাণ হইয়া আজি কোথায় চলিলে?
কেমনে ছাড়িয়া গেলে শরৎ-অনিলে?
অভাগীরে গেলে ফেলে সুধাংশু যে কাঁদিছে লে
মাতৃহারা হয়ে আহা! বাঁচিবে কেমনে?
তার মুখ চেয়ে কি গো বাঁচিলে না প্রাণে?

(৯)

বৃদ্ধা মাতা আজি তব করে হাহাকার,
শেল বিঁধাইয়া দিলে বুকেতে তাঁহার।
কোমল পরাণখানি, মমতার ছিল খনি,
কেমনে নিদয় হয়ে ত্যজিলে সবারে;
একটু কাঁদেনি প্রাণ আমাদের তরে?

(১০)

ধরাতে আসিয়া তুমি কত দুঃখ স'লে!
পরম পিতার কোলে এবে শান্তি পেলে।
বেশ তুমি থাক সেথা, পাবে না মরম-ব্যথা,
দগ্ধ প্রাণে শান্তিধারা বহুক তোমার,
পরমেশ-পদে বোন! প্রার্থনা আমার।

(১১)

যাও বোন! যাও তুমি শান্তির আলয়ে,
চিরদিন তব স্মৃতি রাখিব হৃদয়ে।
তব ভালবাসা বোন, ভুলিতে পারে কি মন?
তোমার পবিত্র এই মুরতি সুন্দর,
আমার হৃদয়-মাঝে রবে নিরন্তর।

(১২)

কোমল ও তনুখানি ধীরে ধীরে ধীরে
নিষ্ঠুর মানব আহা পুড়াইল ঘেরে,
আহা জ্বলেছিল চিতা, গ্রাসিতে সে স্বর্ণলতা,
সেই সে সোণার তনু হায় হায় হায়!
কোন্ প্রাণে সঁপেছিল জলন্ত চিতায়।

তোমার মর্ম্মাহতা ভগ্নী
সরলাবালা ঘোষ।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্তের পুণ্যস্মৃতি।

তুমি কি গো! আসিবে না আর,
আর কি গো! চাহিবে না ফিরে!
স্বর্গে গেলে সকলেই কি গো!
ভু'লে যায় এই পৃথিবীরে?
আপনার সন্তান সন্ততি.
প্রিয়জন, বিষয়-বিভব,
একবার গেলে দেবলোকে,
মানুষ কি ভু'লে যায় সব?

সংসারের আনন্দ, উল্লাস,
ধরণীর সুখ, দুঃখ, আশ;
ধন, মান, সম্পদ, বিপদ,
যশ, দয়া, স্নেহ, ভালবাসা,
আর কি গো! কা'রো আকর্ষণে
মুক্ত আত্মা ফিরেনা পিঞ্জরে?
এত যত্নে আহরণ করি
ফে'লে যায় সব অকাতরে?
ওগো! তুমি গিয়াছ চলিয়া
কত দিন, কত বর্ষ, মাস,
একবারো আমাদের তরে
উঠেনি একটী দীর্ঘশ্বাস?
জীবনের সকল সম্মান
এক পলে কিসে টু'টে যায়?
কোন্ মন্ত্রে বুঝিতে না পারি,
শত আলো আঁধারে মিশায়!
আসিয়াছি বহু দিন পরে
আবার এ মহানগরীতে;
কত স্মৃতি উঠিছে জাগিয়া
আঁখি মেলি চাহি চারি ভিতে।
আজো দেখি সেই কলিকাতা,
চারি দিকে সেই বাড়ী ঘর,
জনস্রোত বহিছে তেমনি
রাজপথ ভরি নিরন্তর।
কত আশা, কত হতাশ্বাস
পাশাপাশি ভাসিয়া বেড়ায়।
কত ধন কত দৈন্য আজো
কেহ কা'রো ফিরিয়া না চায়!
আজিও উঠিছে কত ঘরে
তেমনি আনন্দ-কোলাহল,
কত বুক ভাসা'য়ে এখনো
তেমনি বহিছে অশ্রুজল!
হায়! দেব! ভাবিতে না পারি,
সবি আছে, তুমি শুধু নাই!
আমাদের চির-বরণীয়
হৃদয়ের বিরামের ঠাঁই!
থে'কে থে'কে ভুল হয় মনে
তুমি যেন তেমনি হাসিয়া,
অকস্মাৎ পদধূলি দিতে
দাঁড়াইলে দুয়ারে আসিয়া!
এখনো আঁখির কাছে দেব,
ভাসে তব প্রশান্ত মূরতি,
ভু'লে যাই, "তুমি আর নাই",
ফিরে যায় ভাবনার গতি!
সত্যই কি আসিবে না আর,
আমাদেরে চাহিবে না ফিরে?
স্বর্গে গিয়া সত্যই কি দেব,
ভুলে গেলে এই ধরণীরে?
আপনার সন্তান-সন্ততি,
প্রিয়জন, বিষয়, বিভব,
যশ, দয়া, স্নেহ, ভালবাসা,
সত্যই কি ভু'লে গেছ সব?

শ্রীমতীশর্ম্মিষ্ঠা চন্দ।

---

২৯৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 568. December, 1910.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ. কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ। ৫৬৮ সংখ্যা। { অগ্রহায়ণ, ১৩১৭। ডিসেম্বর, ১৯১০। } ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লর্ড মিণ্টোর বিদায় গ্রহণ—আমাদের নূতন রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জের হস্তে ভারতশাসনের ভার অর্পণ করিয়া লর্ড মিণ্টো ২৩শে নবেম্বর ১২টা ৪০ মিনিটের সময় গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার যাত্রার সময় কেল্লায় তোপধ্বনি হইয়াছিল, এবং রাজকর্ম্মচারীরা উপযুক্ত সম্মানের সহিত তাঁহাকে ষ্টেসনে পৌছাইয়া দিতে গিয়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশপ্রতিগমনের সহায় হউন।

নবীন বড় লাট—আমাদের নূতন বড় লাট হার্ডিঞ্জ মহোদয় ২১শে নবেম্বর, সোমবার, প্রাতঃকালে দশ ঘটিকার সময় হাওড়ায় আসিয়া পৌছেন। হাওড়া ষ্টেসনে বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন। হাওড়া ষ্টেসন হইতে গবর্ণমেণ্ট হাউস পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে সৈনিকগণ ও পুলিস কর্ম্মচারীরা দণ্ডায়মান হইয়া নূতন রাজপ্রতিনিধির সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। কলিকাতাবাসী জনমণ্ডলীও নূতন বড় লাটকে দেখিবার নিমিত্ত বেলা আট ঘটিকা হইতে পথের দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। নবীন বড় লাটের কার্য্যকাল শান্তি ও সুখপূর্ণ হউক, ইহাই প্রার্থনা।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের আবিষ্কার—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্প্রতি এক অপূর্ব্ব হস্তলিপি পাইয়াছেন। ইহাতে শতাধিক অভিনন্দনপত্র লিখিত আছে। বিদ্যানিধি যোগীনামক এক মহাপুরুষ সম্রাট্ শাহ জাহাঁকে অনুরোধ করিয়া কাশী ও প্রয়াগ তীর্থযাত্রীর উপর যে

নির্দ্ধারিত জিজিয়াকর ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। শাহজাঁহার পুত্র দারাও এই ব্যাপারে বিদ্যানিধি যোগী মহাশয়কে অনেক সাহায্য করেন। সেই সময়ের প্রধান নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চানন প্রমুখ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ সম্রাটের যে অভিনন্দন করিয়াছিলেন,তাহারই লিপি শাস্ত্রীমহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, বর্ত্তমান কালের ন্যায় তখনও এ দেশে অভিনন্দন-প্রদান প্রথা প্রচলিত ছিল।

নহাটে সংস্কৃত পাঠশালা – নহাটের বিধবা রাণী বিশ্বেশ্বরী একটী সংস্কৃত চতুষ্পাটী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই পাঠশালায় ন্যায়, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও বেদের অধ্যাপনা হইবে। চারি জন সুযোগ্য অধ্যাপক চারি বিষয়ের অধ্যাপনার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছেন। বিধবা রাণীর এই মহৎ অনুষ্ঠানের শুভ ফল দর্শনের জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম। তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য সফল হউক।

কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নবীন রাজপ্রতিনিধির অভ্যর্থনা— কলিকাতা কর্পোরেশন নূতন বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়কে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছেন। এই অভিনন্দন পত্রের উত্তরে লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্পোরেসনের প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে বলিয়াছেন। মিউনিসিপালিটীর কমিশনরগণ যাহাদের প্রতিনিধি, তাহাদের প্রত্যেক অভাব অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাহার প্রতিকারের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। আপন আপন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া তাঁহাদিগকে অধিবাসিবৃন্দের সুখস্বাচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কমিশনরারগণকে লর্ড হার্ডিঞ্জের এইরূপ সৎপরামর্শ প্রদানে আমরা যার পর নাই সুখী ও আশ্বস্ত হইলাম।

নীতিস্তবক।

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী
ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্যা-
পার্থেষু মূঢ়াঃ খরবদ্‌ বহন্তি ॥১॥
—গর্দ্দভ চন্দনভার করিছে বহন,
অথচ মর্য্যাদা তার না বুঝে কেমন;
বহু শাস্ত্র পড়ে যেই না বুঝে মরম,
সে জন চন্দনবাহী গর্দ্দভের সম ॥১॥

পাটীর ! ধন্যং ভুবি জীবনং তে
প্রাণাংশ্চ দেহং চ মনঃ পুনাসি।
ত্বাং পিংশতোঽপি দহতোঽপি তৃপ্তিম্।
পুষ্ণাসি দিব্যেন সুসৌরভেণ ॥ ২ ॥

—চন্দন! ভুবনে ধন্য তোমারি জীবন!
তব সঙ্গে পূত স্নিগ্ধ হয় দেহ মন;
চূর্ণ করি' যে তোমারে করিছে পেষণ,
যে তোমারে হুতাশনে করিছে দহন,
অপূর্ব্ব সৌরভে মুগ্ধ কর তার মন,
পরহিতে আত্মত্যাগী কে আছে এমন?২॥
সিন্ধুং গতো বারিকণঃ স্বরূপং
হিত্বা যথা সিন্ধুময়ত্বমেতি।
বিশ্বাত্মতাং বিশ্বহিতস্তথা যঃ
প্রয়াতি নিত্যোঽমরপূজিতঃ সঃ॥ ৩॥
—বিন্দু যথা সিন্ধুমাঝে পতিত হইয়া
সিন্ধুময় হয় নিজ স্বরূপ ত্যজিয়া,
তেমতি যে বিশ্বহিতে রত অবিরত,
সে বিশ্বাত্মা-রূপে শেষে হয় পরিণত,
যথার্থ অমর সেই এ মর ভুবনে,
অমরেও করে পূজা তাহার চরণে। ৩।
ভবেঽস্মিন্ পবনোদ্ভ্রান্তবীচিবিভ্রমভঙ্গুরে।
জায়তে পুণ্যযোগেন পরার্থে জীবিতব্যয়ঃ॥৪॥
—পবনে তরঙ্গলীলা সলিলে যেমন,
অনিত্য এ ভবলীলা জানিবে তেমন;
যে করে অনিত্য দেহ পরহিতে দান,
সার্থক জীবন তার, সেই পুণ্যবান্।৪।
পাপেঽপ্যপাপঃ পরুষেঽপ্যভিধত্তে
প্রিয়াণি যঃ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা॥৫॥
—দারুণ শত্রুর প্রতি নিষ্পাপহৃদয়,
রুষ্ট ভাবে গালি দিলে মিষ্ট ভাষা কয়;
প্রেমে গলি' যার আত্মা হয় বিশ্বময়,
তাহার নির্ব্বাণমুক্তি তারি হস্তে রয়।৫।
যে সর্ব্বত্যাগিনঃ পুণ্যা ব্রহ্মজ্ঞাঃ সমদর্শিনঃ।
লতাতীর্থস্বরূপাস্তে চরিত্রৈর্লোকপাবনাঃ॥৬॥

—এক মাত্র সর্ব্বেশ্বরে হেরি' সর্ব্বময়,
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি যাঁহাদের রয়;
লোকহিতে সর্ব্বত্যাগী, ভুবনপাবন,
এ ভবে যথার্থ তীর্থ সেই সাধুগণ। ৬।
যস্ত বিশ্বহিতং যজ্ঞো হবামাত্মা চ সংস্কৃতঃ।
রিপবঃ পশবো বধ্যাঃ স এব খলু যাজ্ঞিকঃ॥৭॥
—বিশ্বহিত যজ্ঞে অগ্নি হৃদে যার জ্বলে,
আত্মাকে আহুতি যেই দেয় সে অনলে,
কামাদি ইন্দ্রিয়-পশু করে বলিদান,
যথার্থ যাজ্ঞিক ভবে সেই পুণ্যবান্। ৭।
হিরণ্ময়ৈরত্নৈরপি দীপ্যমানং
ন মন্দিরং মন্দিরমীশ্বরস্য।
মহাত্মনো বিশ্বজনীনবৃত্তেঃ
সাধোর্মনো মন্দিরমেব তস্য॥৮॥
—সুবর্ণ মন্দির তুমি করিয়া নির্ম্মিত,
প্রদীপ্ত রতনে তাহা কর সুসজ্জিত,
ঈশ্বরের তাহে নাহি হয় অধিষ্ঠান,
বৈভবে ভোলে কি কভু বিভু ভগবান্?
যে মহাত্মা বিশ্বহিতে সঁপিয়াছে প্রাণ,
তাঁরি হৃদে ঈশ্বরের নিত্য অধিষ্ঠান।৮।
সর্ব্বত্র বাতি পবনোঽনিশমেব মৌনং
মৌনং দদাতি কিরণান্ তপনঃ শশী চ।
নিঃশব্দমেব কুসুমানি কিরন্তি রাগং
সাধুঃ সদা পরহিতানি করোতি
মৌনম্॥৯॥
—নীরবে সর্ব্বত্র সদা বহে সমীরণ,
চন্দ্র সূর্য্য নীরবেই দিতেছে কিরণ,
নিঃশব্দে কুসুম করে সৌরভ বিস্তার,
নীরবেই সাধে সাধু পর-উপকার। ৯।
আপাততঃ খলু মহাশয়চক্রবর্ত্তী
বিস্তারয়ত্যকৃতপূর্ব্বমুদারভাবম্।

কালাগুরুর্দহনমধ্যগতঃ সমন্তাৎ
লোকোত্তরং পরিমলং প্রকটীকরোতি॥১২।
যেই জন অসামান্য মাহাত্ম্য-আধার,
বিপদে অভূতপূর্ব্ব মাহাত্ম্য তাঁহার ;
অগুরুচন্দন দেখ ! পুড়িয়া অনলে,
আমোদিত করে দিক্ দিব্য পরিমলে।১২।
ন শৌচং দেহসংস্কারে নেন্দ্রিয়ার্থেষু বা
সুখম্।
সদা সুখং চ শৌচং চ শুদ্ধভাবং সমা-
শ্রিতম্ ॥১৩॥
—দেহের সংস্কার নহে শুদ্ধির কারণ,
সুখের সাধন নহে ইন্দ্রিয়সেবন,
হৃদয়ে বিশুদ্ধ ভাব যে করে পোষণ,
সর্ব্বকালে শুদ্ধ সেই, সুখী সেই জন।১৩।
কৃতাং তীক্ষ্ণমপি প্রেয়ঃ সত্যতেজঃ
সুধাময়ম্।
ন্যায্যে যস্য তৃণং বাধা স তেজস্বী
নরোত্তমঃ ॥১৪॥
সত্যের প্রখর তেজ যার সুধাময়,
কঠোর কর্ত্তব্যে যার প্রফুল্ল হৃদয়,
ন্যায়-পথে বিঘ্ন-বাধা যার তৃণজ্ঞান,
যথার্থ তেজস্বী সেই মনুষ্য-প্রধান।১৪॥

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

(ক্রমশঃ)

বৈধব্য জীবনের চিত্র।

আমাদের দেশে বালবিধবার অভাব নাই, গৃহে গৃহে এই শোচনীয় দৃশ্য বিরাজ করিতেছে। এই বালিকাগুলির দুরবস্থার কথা চিন্তা করিতেও হৃদয় অধীর হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, কিন্তু সমাজ এই দুঃখিনী বিধবাদিগের দুঃখময় জীবনের প্রতি একেবারে উদাসীন। সমাজের লোকে মনে করে, বিধবাদিগকে উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদন ও আশ্রয় দান করিলেই তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু বিধবাদের শূন্য নীরস প্রাণে যে তাহাতে শান্তি পায় না, তাহা কেহ উপলব্ধি করেন না ; এবং করিলেও তৎপ্রতিবিধানে কাহাকেও চেষ্টা করিতে দেখা যায় না।

বিধবা হইলেই যেরূপ তাহাদের আহারাদির ব্রহ্মচর্য্যবিধানানুযায়িনী ব্যবস্থা করা হয়, তদ্রূপ বিধবার জীবনোপযোগী শিক্ষারও আয়োজন করা উচিত। বিধবাদের খাদ্যাখাদ্য ও বেশভূষার বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যেমন আবশ্যক, তাহাদের ব্যবহার সুমার্জ্জিত করা এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করাও সেইরূপ প্রয়োজনীয়।

"বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য" এ কথা অনেকের মুখে শুনা যায় বটে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে, তাহা কয়টী বিধবা অবগত আছেন ? শিক্ষার অভাবে ব্রহ্মচর্য্য শব্দটী কথায় মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহার ফল অমৃতে

গরল। কিন্তু কাহারও তৎপ্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই।

বিধবাদের মানসিক উন্নতি কিম্বা চরিত্র সুগঠিত করিবার জন্য কাহাকেও বিশেষ যত্ন করিতে দেখা যায় না। অথচ তাহাদের দোষ দেখিতে পাইলে সকলে শতকণ্ঠে তাহা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। এমন কি, সামান্য ব্যবহারের বা কথার ত্রুটিতেও বিধবা পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগিনীর নিকটে পর্য্যন্ত ক্ষমা পায় না। এ সংসারে বিধবাদের জীবনের মত বিড়ম্বিত জীবন আর কাহারও নাই।

শিক্ষার অভাবে একটী বিধবা-জীবনের যে শোচনীয় পরিণাম দেখিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

একটী স্ত্রীলোক ষোড়শ বৎসর বয়সে বিধবা হয়, বৃদ্ধা শাশুড়ী ব্যতীত তাহার অপর কোন অভিভাবক ছিল না। সে তাহার শাশুড়ীর সহিত কোন আত্মীয়ের আশ্রয়ে বাস করিত। কয়েক বৎসর পরে মাতৃসমা বৃদ্ধা শাশুড়ী অভাগিনীকে নিরাশ্রয়া করিয়া পরলোক গমন করেন।

উক্ত বিধবার যৎসামান্য অর্থ আশ্রয়-দাতার নিকট গচ্ছিত ছিল। হতভাগিনী বিধবাটী সুন্দরী বলিয়া শীঘ্রই কুলোকের দৃষ্টি তাহার প্রতি পড়িল, এবং সে প্রলোভনের মোহজালে আচ্ছন্ন হইয়া, জীবনের মহৎ লক্ষ্য ভুলিয়া অধঃপতিতা হইল। কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল না, কিন্তু তাহার দুর্নাম ঘোষণা করিতে কেহ ত্রুটি করিল না। আশ্রয়দাতা কিছু দিন তাহাকে নিজ জ্ঞান বুদ্ধিমতে শাসন করিয়া গৃহে রাখিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু সেইরূপ শাসনে তাহার কি হইবে? সে ক্রমে ক্রমে একেবারে পাপস্রোতে জীবন ভাসাইয়া দিল। পরে অপরাপর প্রতিবেশিগণ একত্র হইয়া পরামর্শ করিয়া তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিল। তখন সে অপর এক আত্মীয়ের বাটীতে আশ্রয় লইল, কিন্তু সে স্থান হইতে তদপেক্ষা অধিক লাঞ্ছিতা হইয়া তাড়িতা হইল। কয়েক বৎসর পরে একদিবস দেখিলাম, তাহার গচ্ছিত অর্থ প্রতারকের প্ররোচনায় হারাইয়া অনাথা ভিখারিণীর বেশে পথে পথে ক্রন্দন করিয়া বেড়াইতেছে। অন্নাভাবে শরীর কৃশ ও মলিন, তৈলাভাবে কেশ রুক্ষ, শত গ্রন্থিযুক্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া কাঁদিতেছে। তখন আর তাহার পূর্ব্বের সে সৌন্দর্য্য নাই।

কিছুদিন পরে শুনিলাম তাহার আর কোন খোঁজ নাই। তাহার উদ্ধারের চেষ্টা কেহই করিল না। এই ত আমাদের সমাজের অবস্থা! এই ত আমাদের সমাজের বিচার! হতভাগিনী বিধবা অসহায়া বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। আর অশিক্ষিতা অসহায়া রমণীর অধঃপতনের মূল যে পুরুষ, তিনি সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া সমাজের দশ জনের মধ্যে একজন হইয়া সুখভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি কোন শাসন

নাই, কোন বিচার নাই। শাসন-বিচারের কোন বিধিব্যবস্থাও নাই। পরিতাপের কথা কি বলিব, তাঁহারাই নাকি কোন কোন স্থলে সমাজপতি।

এ সংসার পাপপ্রলোভনময়। শিক্ষিত পুরুষ পর্য্যন্ত অসার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়া নানা দুর্গতি ভোগ করেন। কোমলমতি অশিক্ষিতা বিধবা এই ভীষণ পরীক্ষানল হইতে কি প্রকারে রক্ষা পাইবে? কঠোর শাসন ও সমাজ-ভয় বিধবাকে কতকটা রক্ষা করে বটে, কিন্তু তাহাতেই কি তাহাদের দুর্গতি দূর হয়? মানুষকে পশুর মত শাসন করিলেই কি বিধবার প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হয়?

সুশিক্ষার অভাবই বিধবাদের অধঃপতনের ও দুঃখের মূল কারণ। আমাদের সমাজের অধিকাংশ মেয়েরা যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা করে, তাহা শিক্ষাই নহে। সধবা রমণীদের এরূপ শিক্ষায় ক্ষতি না হইলেও বিধবাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে।

ধর্ম্মসাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান দুর্লভ বলিয়া তাহারা সহজলব্ধ আশুতৃপ্তিকর কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস ও নাটক সর্ব্বদা পাঠ করিয়া থাকে। জ্ঞানাভাবে তাহারা ঐ সকল গ্রন্থোল্লিখিত বিষয়ের প্রকৃত অর্থ ও আদর্শ চরিত্রের মহৎ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া শুধু কল্পিত ভাবের মধুরতায় মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হয়। ইহাতে তাহাদের মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি হইয়া পরিণামে দুঃখভোগ হয়, ইহার কি কোনও প্রতিকার করিতে পারা যায় না?

শিক্ষার গুণে অসভ্য সুসভ্য হয়, বর্ব্বর বুদ্ধিমান্ হয়, বন্য পশু পক্ষী পর্য্যন্ত শিক্ষার গুণে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়া থাকে; কোমলমতি বিধবা বালিকাগুলি সুশিক্ষা ও যত্ন পাইলে কি মনুষ্যনামের যোগ্য হইতে পারে না? যাহারা শিক্ষার অভাবে নিজ হিতাহিত বুঝিতে অসমর্থ, তাহাদের মঙ্গল কি প্রকারে সম্ভবে? সংসারে পুরুষ শিক্ষিত ও সবল, স্ত্রীলোক দুর্ব্বলা, কোমলপ্রাণা ও পুরুষের আশ্রিতা। সর্ব্বদা; তাহারা আত্মরক্ষার জন্য পুরুষের উপর নির্ভর করে। প্রায় সকল পুরুষই অবস্থানুরূপ অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিয়া উন্নতি লাভ করিতেছে। তথাপি তাহাদের মধ্যেও সময়ে সময়ে কাহারও পতন অনিবার্য্য। এ অবস্থায় অশিক্ষিতা দুর্ব্বলা বিধবা রমণীদিগের পাপ প্রলোভন ও পরীক্ষাপূর্ণ সংসারে একাকিনী আপনার উপর নির্ভর করত আত্মরক্ষা করিয়া কুটিলতাময় এ সংসারে জীবনপথে অগ্রসর হওয়া কি প্রকার ভয়াবহ এবং তজ্জন্য কত চিন্তা, কত ধৈর্য্য, জ্ঞান, সংযম ও দৃঢ়তা ইত্যাদি গুণের প্রয়োজন, তাহা কেহ কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? শিক্ষাভাবে একাধারে সমঞ্জস ভাবে এই সকল সদ্‌গুণ লাভ করা কি সহজ? হিংস্র জন্তু ও দস্যু-তস্কর-পরিপূর্ণ অরণ্যে পথিকের একাকী গমনাগমন করা যেরূপ কঠিন, নানা প্রলোভন ও নির্য্যাতনময় সংসার-অরণ্যে সঙ্গিবিহীনা অনাথা বিধবাদের

বিচরণ করা তদপেক্ষাও বিপদসঙ্কুল সংসার-অরণ্যে একাকী বিচরণ করিবার উপযোগী একটী জীবন প্রস্তুত করিতে কি সামান্য যত্ন চেষ্টার প্রয়োজন? যেমন পতঙ্গগণ অনলের দাহিকা শক্তি না জানিয়াই অনলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে পুড়িয়া মরে, তদ্রূপ বিধবাগণও পাপ-প্রলোভন-মুগ্ধ হৃদয়ে নিজ নিজ হিতাহিত বুঝিতে অক্ষম বলিয়াই সময় সময় নানা প্রকার বিপদে পতিতা হয়। তাহারা আত্মরক্ষার উপযোগিনী শিক্ষা না পাইলে কিরূপে নিরাপদ থাকিবে? সচরাচর দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের নিকট অবজ্ঞার পাত্র ও নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হয়, সে কখনও আত্ম-সম্মান লাভ করিতে শিখে না। আত্ম-সম্মানজ্ঞানের অভাবে আত্মোন্নতির চেষ্টা মনে জাগ্রত হয় না। এই জন্যই ঐরূপ নিগৃহীত ব্যক্তিদের প্রায় উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র হইতে দেখা যায়। স্নেহে যত্নে কর্কশ প্রকৃতিও কোমল হয়, পতিত ব্যক্তিও চরিত্রবান্ হয়, অসাধুও সাধু হয়, এরূপ দৃষ্টান্ত মানবসমাজে বিরল নহে। আমাদের সমাজে বিধবাগণ সর্ব্বদাই অনাদৃতা, এবং অভাগিনী বলিয়া তাহারাই পরিবারের অমঙ্গলের হেতু। এরূপ স্থলে তাহাদের উন্নতির আশা কোথায়? বাল-বিধবা এ সংসারে পবিত্র কুসুম, ভগবৎ-চরণই ইহাদের উপযুক্ত স্থান। আমরা আমাদের পুষ্পোদ্যানে যে সকল পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করি, তাহাতে কত যত্নে জল ও সারাদি দিয়া থাকি, তাহার মূল হইতে অনিষ্টকারী কীটসকল বাছিয়া দিয়া বৃক্ষকে সযত্নে রক্ষা করি, তবে সে বৃক্ষ ফল-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে আমাদিগকে আমোদিত করে; এবং আমরা সে ফল ফুল দেবতার চরণে দিয়া কৃতার্থ হই। আর এ সংসার-উদ্যানের বাল-বিধবা-রূপ কুসুমকলিকাগুলি অনাদরে অযত্নে শুকাইয়া যাইবে না কি? উহাদের মানসিক পোকাগুলি বাছিয়া না দিলে কীটদষ্ট হইয়া ঝরিয়া পড়িবে না কি? ঐ অবস্থায় কি তাহারা দেবপূজার যোগ্য থাকিতে পারে? বিধাতার বিধানে সকলেই স্বামী পুত্র লইয়া সংসার করিবে ইহা যেমন অসম্ভব, বিধবা হইলেই যে তাহার জীবন জলন্ত অনলময় হইবে, ইহাও তেমনি অসম্ভব। বৈধব্য জীবন কি শান্তি-পূর্ণ হইতে পারে না? করুণাময়, প্রেমময় হরি তো কাহাকেও করুণা-প্রেম-বিতরণে বিমুখ নন। পশু-পক্ষী-স্থাবর জঙ্গমাদি সকলি তাঁহার প্রেমাধীন, একমাত্র বিধবা রমণীই কি তাঁহার প্রেমে বঞ্চিতা থাকিবে? কখনই নয়! তাঁহার অনন্ত সর্ব্বব্যাপী প্রেমে নর-নারী, সধবা-বিধবা, পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকলেই সমান অধিকারী। তাঁহার রাজ্যে এ অবিচার, হাহাকার কেন? শিক্ষা ও যত্নের অভাবই বিধবাজীবনের দুঃখের মূল। তাহাদের জীবন উন্নত ও সুখশান্তিপূর্ণ করিবার প্রধান উপায় তাহাদের জীবনোপযোগী সৎশিক্ষা। (ক্রমশঃ)

আব্রাহাম্ লিন্‌কন্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ।)

১৮৩৩ খৃঃ অঃ নিউস্যালেমের পোষ্ট মাষ্টারের পদ শূন্য হয়। আব্রাহাম্ উক্ত-পদের প্রার্থী হইয়া আবেদন করিলেন। ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বহুসংখ্যক আবেদনপত্রের মধ্য হইতে আব্রাহামের আবেদনপত্র মঞ্জুর করিলেন। পোষ্ট-মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া আব্রাহাম্ সুচারুরূপে আফিসের কার্য্যাদি চালাইতে লাগিলেন। এই সকল কার্য্যকালে তিনি অশিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং ইহার জন্য তিনি সময়ে সময়ে স্বীয় স্বার্থবিসর্জনেও কুণ্ঠিত হন নাই। বহুসংখ্যক লোক প্রত্যহ মিষ্টার এলিসের ব্যবসায়-ভাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত হইত; আব্রাহাম্ অফিসের কার্য্যাদি সমাপনান্তে তাহাদিগকে নানা সদ্গ্রন্থ ও সংবাদপত্র হইতে রাজনৈতিক ও অন্যান্য অনেক বিষয় পাঠ করিয়া শুনাইতেন।

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারীও দরিদ্র সজ্জনের বন্ধুত্বলাভে অভিলাষী হইয়া থাকেন। আব্রাহাম্ লিনকনের দেশব্যাপী সুযশ ইণ্ডিয়ানার শাসনকর্ত্তার শ্রবণগোচর হইল। তিনি আব্রাহামের সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আব্রাহাম্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লিন্‌কনের সহিত আলাপ করিয়া শাসনকর্ত্তা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং এক দিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, এ যুবক যুক্তরাজ্যের সভাপতির পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

১৮৩৪ খৃঃ অঃ আব্রাহাম্ লিনকন অনুরুদ্ধ হইয়া পুনরায় ব্যবস্থাপকপদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। উপযুক্ত ব্যক্তির নির্ব্বাচনই সাধারণের প্রার্থনীয়। ভোট সংগ্রহ করিবার জন্য আব্রাহাম্ একদিন এক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার এক ধনী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। বন্ধুর অনুরোধে আব্রাহাম্ তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। আহারাদির পর তিনি বন্ধুর কার্য্যক্ষেত্রে শ্রমজীবিগণের নিকট ভোট সংগ্রহ করিতে গমন করেন। প্রভুর আদেশে কৃষকেরা আব্রাহাম্‌কে ভোট দিবে স্বীকার করিল, কিন্তু আব্রাহাম্ তাহাদিগের ন্যায় পরিশ্রমপটু কিনা তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আব্রাহাম্ অবিলম্বে তাহাদিগের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কৃষকেরা তাঁহার শ্রমদক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রাণপণ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আব্রাহাম্ অন্য এক স্থানে ভোট সংগ্রহ করিতে যাইতেছিলেন। তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন না; পথিমধ্যে তাঁহাকে

দেখিয়া একজন লোক অন্য এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিল,—দেশে কি ইহার অপেক্ষা ব্যবস্থাপকপদের উপযুক্ত আর কোনও লোক নাই? কিন্তু শেষে সেই উপহাসকারী আব্রাহাম্ লিন্‌কনের গুণের এবং বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া যুগপৎ মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিল। এবার আব্রাহামের চেষ্টা বিফল হইল না; তিনি সহস্র সহস্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপক মনোনীত হইলেন।

বেশভূষার পারিপাট্যের দিকে আব্রাহাম্ লিনকনের একবারেই দৃষ্টি ছিল না। গুণবান্ পুরুষেরা সর্ব্বত্রই সমাদর প্রাপ্ত হন। বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সকলে তাঁহাদের গুণেরই প্রশংসা করিয়া থাকে। কিন্তু এত দিন সামান্য পরিচ্ছদে দিন অতিবাহিত করিলেও, ব্যবস্থাপক মনোনীত হইবার পর, আব্রাহাম্‌কে বেশভূষার পরিপাট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছিল। তিনি দুই শত ডলার ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থাপকের উপযুক্ত পরিচ্ছদাদি ক্রয় করিলেন। আমরা এইখানেই বলিয়া রাখি, তিনি শীঘ্রই উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছিলেন।

ব্যবস্থাপকপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আব্রাহাম্ লিনকন্ মাননীয় জন্ ইষ্টুয়ার্ট নামক স্প্রিংফিল্‌ডের জনৈক সম্ভ্রান্ত আইনব্যবসায়ীর সহিত পরিচিত হন। আব্রাহামের প্রতিভাদর্শনে চমৎকৃত হইয়া মিষ্টার ইষ্টুয়ার্ট তাঁহাকে আইন পাঠ করিতে পরামর্শ দিলেন। আব্রাহাম্‌ও তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। মিষ্টার ইষ্টুয়ার্ট তাঁহাকে আইন সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ প্রদান করিয়া বিলক্ষণ সাহায্য করিতে লাগিলেন। অতি অল্প কাল মধ্যেই আব্রাহাম্ একজন বিবেচক আইনজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিলেন। এটর্ণি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্প্রিংফিল্ডে মিষ্টার ইষ্টুয়ার্টের সহিত আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ভ্যাণ্ডেলিয়ার পরিবর্ত্তে স্প্রিংফিল্ড এই সময় ইলিনয় রাজ্যের রাজধানী হয়। স্প্রিংফিল্ডে আসিয়া আব্রাহাম্ দুই কার্য্যই চালাইতে লাগিলেন। ১৮৩৭ খৃঃ অঃ দ্বিতীয় বার ব্যবস্থাপক মনোনীত হইয়া দাসব্যবসায়ের প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে অনেকেই নিষ্ঠুর দাসব্যবসায়ের পক্ষ সমর্থন করিতেন বলিয়া আব্রাহাম্ একাকী কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি যখন আপনার অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা দাসব্যবসায়ের অনিষ্টকারিতা প্রমাণ করিতেন, তখন অন্যান্য সভ্যগণ স্তম্ভিত হইতেন। কেবল ডন ষ্টোন (Dan stone) নামক জনৈক সভ্য আব্রাহামের পক্ষে ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথনাথ বসু।

স্ত্রীলোকদিগের কার্য্য।

আমোদের কাজ।

কর্ত্তব্য কার্য্যে মানুষের জীবনের প্রায় সমস্ত বৎসর, মাস ও ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। তথচ সময়ে সময়ে আমরা এমন একটু আধটু অবসর পাই, যখন আমরা কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি না, কিম্বা উহাতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া স্বাস্থ্যের অনুরোধে বিশ্রাম বা আমোদের ইচ্ছা করি। তখন আমরা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহি, অথচ আপনাকে নিষ্কর্ম্মা রাখিতে ইচ্ছা করি না; তখন আমরা অনেক দিনের পর পিত্রালয়ে যাইয়া সংসারের কর্ম্ম হইতে অবসর পাই, অথচ কোনও না কোনও হাল্‌কা কাজ করিতে অভিলাষিণী হই। এই প্রকার সময়টা আমরা আনন্দ ও আমোদের কাজে কাটাইতে পারি। যে কোনও নারী কখনও নিকর্ম্মা থাকিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহার দ্বারা অবসরসময়ে যে কত ছোট খাট কাজ সম্পন্ন হইতে পারে তাহা বলা যায় না। বোধ হয়, অনেক পাঠিকা একজন ইংরাজ ডাক্তারের কথা পড়িয়া থাকিবেন। তিনি তাঁহার রোগীদিগকে দেখিয়া বেড়াইবার সময় গাড়ীতে যেটুকু সময় পাইতেন, সেই অবসরে এক বৃহৎ লাটিন গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। আর একজন শিক্ষক তাঁহার ছাত্রদিগকে পড়াইবার জন্ম বাড়ী বাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়া ঘুরিবার সময় যে কিছু সময় পাইতেন, সেই অবকাশে ফরাসী ও ইটালীর দুইটী ভাষা শিখিয়াছিলেন। একজন ফরাসী স্ত্রীলোক কোনও রাজকন্যার কাছে সঙ্গিনীর কাজে নিযুক্তা থাকিবার কালে মাঝে মাঝে যে কিছু সময় পাইতেন, সেই অবসরে দশ বার খানা পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

এইরূপে অবসরকাল কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য আমাদের কত শত পথ খোলা রহিয়াছে। পৃথক্ পৃথক্ ধরিলে সব কাজই অতি সামান্য বোধ হয়; কিন্তু সকল কার্য্যের সমষ্টি একত্র ধরিলে উহা দ্বারা আমাদের বাসগৃহের কত সুন্দর পরিবর্ত্তন হয়, দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই। নিপুণ হাত দুটী অবিশ্রান্ত কোনও না কোনও কাজে রত রাখিলে অল্পকালে ও অতি সামান্য ব্যয়ে আমরা কত সুন্দর সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া গৃহকে মনোরম করিতে পারি। রমনী গৃহের রাণী, সেই গৃহকে নিজ শিল্পকর্ম্মের দ্বারা সজ্জিত করিলে সর্ব্বত্র তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্ম্মচাতুর্য্য প্রকাশ পায়।

জ্ঞান, বিদ্যা ও শিল্প আমরা যাহাই শিখি, ঘরকন্নার সকল দ্রব্যে ও সকল কাজে তাহার মার্জিত চিহ্ন আঁকিতে না পারিলে আমাদের সেই বিদ্যা বা শিল্পশিক্ষায় কোনও ফল হয় না।

তোমার বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবাসীরা যদি তোমার বাড়ীর মনোরম সাজ ও শোভা দেখিয়া নিজ নিজ গৃহকে সেইরূপ সাজাইতে অভিলাষী হয়, তোমার কাজের পরিচয়ে তাহারাও যদি কাজে কৃতসঙ্কল্প হয়, তাহা হইলে জানিবে, এ সংসারে তুমি বৃথায় জন্মাও নাই। তোমার মহৎ দৃষ্টান্তে কত বিশৃঙ্খল গৃহ, পরিপাটী হইবে, বিমর্ষ গৃহ শোভাময় হইবে, আর মানুষের আবাসগৃহ অধিকতর মধুর হইয়া উঠিবে। পশমের ফুল, ছবি, পাখী, ফল, টাকা প্রভৃতি দ্রব্যে গৃহের যে কত শোভা বৃদ্ধি হয়, ও আমাদের পিতা-ভ্রাতা-স্বামীরা কত আনন্দিত হন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক সময়ে আমাদের নিজ হাতের তৈয়ারী এক জোড়া পশমের বা রেশমের জুতা বা মোজা উপহার পাইলে আমাদের আত্মীয়েরা কতই আহ্লাদিত হন।

সকল প্রকার পশমের শিল্পের ব্যবস্থা লিখিয়া নারীদিগকে আমোদের কাজ শিখান অসম্ভব ভাবিয়া আমি উহা হইতে বিরত হইলাম। যাঁহাদের একটু বুদ্ধি আছে, তাঁহারা দুই একটা কাজ শিক্ষয়িত্রী বা প্রতিবাসিনী কোনও স্ত্রীলোকের নিকট শিখিয়া অবশিষ্ট সকল কাজ নিজেই প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

দুঃখের বিষয়, নব্য বঙ্গনারীদিগের মধ্যে প্রাচীন কালের মহিলাদের ন্যায় চিত্র-বিদ্যার কিছুমাত্র চর্চ্চা দেখা যায় না। আর পাড়াগাঁয়ে ও নারীদের মধ্যে মাটিতে বা পিঁড়েয় আলিপনা দেওয়ার যা একটু আমাদের আঁক কাটার অভ্যাস হইত, তাহাও আজকাল উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু ভদ্র বালিকারা ইচ্ছা করিলেই স্কুলের পাঠের সঙ্গে একটু একটু চিত্র-বিদ্যাও শিখিতে পারে। দু আনা বা চার আনা দিয়া এক বাক্স রং ও তুলি কিনিয়া মোটা খাতার কাগজের উপর ফুলপাতা, গাছপালা ইত্যাদি আঁকিতে আঁকিতে চিত্রবিদ্যায় কিছু জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা। কাগজের উপর প্রথম লেড পেন্সিল দিয়া দাগ কাটিয়া পরে যেখানকার যেটী রং বসাইলেই আঁকিবার অধিক সুবিধা হয়।

যদিও উন্নত চিত্রকার্য্যে পারদর্শিনী হইতে অনেক শিক্ষা, অভ্যাস ধৈর্য্য, ও সময়ের আবশ্যক, তথাপি যত্ন করিলে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা খাটিয়া দুই বৎসরের মাঝামাঝি শিক্ষা করা যায়। উহা দ্বারা আর কিছু কাজ না হউক, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার সময় অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। কাগজের উপর রং দিয়ে বড় বড় অক্ষর লিখিলে ও কুকুর বিড়ালের ছবি আঁকিলে শিশুরা অতি আনন্দে শিক্ষায় মনোযোগ করে ও সহজেই উহা স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে। চিত্রবিদ্যায় কিছু বেশী জ্ঞান জন্মিলে আমাদের রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে দৃশ্য বাছিয়া লইয়া ঐ গুলি আঁকিয়া গৃহের দেওয়ালে সাজাইলে যে ঘরের শোভা ও সৌন্দর্য্য বাড়িবে, তাহাতে

কোনও সন্দেহ নাই। কর্ত্তব্য কাজের মধ্যে যদিও আমি স্ত্রীলোকদের পড়ার কথা লিখিয়াছি, তথাপি আমোদের কাজের সঙ্গেও পাঠের বিষয়ে দু চারিটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। কারণ, আমার মতে, অধ্যয়ন মানবজীবনে—কর্ত্তব্য,আমোদ ও প্রয়োজন - সবই। আর স্ত্রীজাতিকে উহার উপকারিতা বুঝাইবার জন্য আমি উহার উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যদি প্রকৃত মানুষ হতে চাও, যদি মানবজীবনের মহত্ব বুঝিয়া থাক, সংসারে যদি সুখী ও জ্ঞানী হইতে ইচ্ছা কর, তবে একদিনের জন্য পাঠে অবহেলা করিও না।

এই বিষয়ে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—পিতামাতারা যেন কন্যাদিগকে গল্পের বই পড়া বিষয়ে বেশী কড়াকড় না করেন। কিন্তু বালিকাদের প্রতি আমার আন্তরিক বক্তব্য এই—সামান্য গল্পের বই বা উপন্যাস পড়িয়া সন্তুষ্ট হইও না; বরং উহা দ্বারা আরও ভাল পুস্তক পড়িবার রুচিতে অভ্যস্ত হও। বঙ্গমহিলারা যদি একবার একটু মনোযোগপূর্ব্বক দুই একখানা সার গ্রন্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন ও উহা হইতে জ্ঞানের সঙ্গে আনন্দলাভ করেন, তাহা হইলে আপনা হইতেই অকেজো বইয়ের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা জন্মিবে। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অধ্যয়নই বঙ্গনারীকে উন্নতপদে তুলিবার প্রধান উপায়।

সকল বিষয়েই ঐরূপ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম আদর্শ দেখিয়া তার নিকটবর্ত্তী হইবার চেষ্টাই প্রকৃত উন্নতি ও সভ্যতার কারণ। উন্নত চিন্তা ও মার্জ্জিত রুচি আপেক্ষিক সামান্য ভাব ও রুচিবিরুদ্ধ অভ্যাসগুলিকে তাড়াইয়া দেয়। যে কোনও রমণী অভিজ্ঞান শকুন্তলের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন,তিনি আর কুরুচিপূর্ণ ঘৃণিত পুস্তকে কখনও মন দিতে পারেন না। যিনি হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' পাঠে সুখ অনুভব করিয়াছেন, তিনি কখনও দাসুরায়ের পাঁচালী স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক হইবেন না। সুতরাং একখানি সার গ্রন্থ মনোযোগপূর্ব্বক পড়িয়া আমাদের মনকে একবার উন্নত করিলে উহা কখন কদর্য্য উপন্যাসের দিকে ধাবিত হইবে না।

ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, আমাদের মানসিক ইচ্ছা, স্পৃহা ও রুচি আমাদের নিজের উপরই একান্ত নির্ভর করে। আমরা ভাল পুস্তক পড়িতে অভ্যাস করিলে উহা হইতেই প্রচুর আনন্দ পাই, আর মন্দ বই পড়িয়া মনকে বিকৃত করিলে সদ্গ্রন্থের উপর অশ্রদ্ধা জন্মে। নূতন সার গ্রন্থ সময়ে পাইবার সুবিধা না থাকিলে পুরাণগুলিই বার বার পড়াতে অনেক উপকার হয়।

গান-বাজনা।

লেখা পড়ার সঙ্গে অল্প অল্প সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করাও বালিকাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। উহা যে ব্যক্তিবিশেষের আনন্দের কারণ, শুধু তাহা নহে, উহা দ্বারা সমস্ত

পরিবার-জীবন অধিকতর প্রফুল্ল, সদ্ভাব-পূর্ণ ও আনন্দিত থাকে। কন্যাদের গান-বাজনা শুনিয়া পিতামাতা পরম পুলকিত হন। ভগিনীর বাজনা শুনিয়া ভ্রাতা, স্ত্রীর বাদ্য-সঙ্গীতে স্বামী যার পর নাই সুখ ও আমোদ পান। গান বাজনায় মন রত থাকিলে অন্তরে কুচিন্তা বা কুভাব আসিবার উপায় থাকে না। উহাতে শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই একরূপ আনন্দ অনুভব করে।

অন্যান্য কঠিন সাধনার ন্যায় গান-বাজনাতে পারদর্শিনী হইতে অনেক অভ্যাস ও সময়ের আবশ্যক। প্রতিদিন এক ঘণ্টা করিয়া বাজনাশিক্ষায় সময় দিলে দুই বৎসরে উহাতে একরকম পারগ হওয়া যায়। অবশ্য উহাতে উত্তম-রূপে অভিজ্ঞ হইতে অনেক অধিক সময়ের প্রয়োজন। আমার বোধ হয়, হিন্দুবালিকাদের জন্য—সেতার, বীণা, বেহালা, হার্ম্মোনিয়ম এই কয়টী বাদ্যযন্ত্র শিক্ষার যোগ্য। উহার কোনও একটী বাজানতে সক্ষম হইলেই সাধারণ বালিকা-দিগের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। বেহালা, সেতার প্রভৃতি তারের যন্ত্র উত্তমরূপে বাজাইতে শিখিবার জন্য আপেক্ষিক অনেক বেশী বুদ্ধি ও সময়ের আবশ্যক। হার্ম্মো-নিয়ম বা পিয়ানো ইত্যাদি বাজনা কিছু কম দিনে শিখা যায়। আজকাল নিজে গান বাজনা শিখিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় দুই একখানি সরল বই লিখিত হইয়াছে, তাহাদেরই একখানি কিনিয়া বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজনা অভ্যাস করিতে করিতে উহা সহজ হইয়া আসিবে।

মিসেস্ ডি, এন, দাস।

অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার উন্নতি-সাধনের উপায়।

"ভাই ভগিনী মিলে, যাব সারি সারি চলে,
তব সিংহাসনতলে হে;
যাব সবে হাত ধরে, গাইব আনন্দভরে,
দয়াময়! তব গুণগান হে।"

অন্তঃপুরস্থা ইঁহারা কে? কেনই বা ইঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের এত মাথাবাথা? ইঁহারা আমাদের মাতা, ভগিনী, স্ত্রী বা দুহিতা,—যাঁহাদের সুখ-দুঃখের সহিত আমাদের সুখদুঃখ এত নিকটতম ও গূঢ়ভাবে মিলিত রহিয়াছে—যাঁহাদের উন্নতির উপর পারিবারিক ও সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি বহুল পরি-মাণে নির্ভর করিতেছে।

একজন ইতালীয় কবি বলিয়াছেন, "শিক্ষা মনুষ্যের চরিত্রকে মার্জ্জিত করে ও তাহাকে বর্ব্বর থাকিতে দেয় না।" শিক্ষা মানসিক, শারীরিক, হৃদয়ের নৈতিক বৃত্তি সকলকে সুন্দররূপে পরি-

চালিত করে ও তাহাদের কার্য্যকারিতা বর্দ্ধিত করে। শিক্ষা তিন প্রকার, মানসিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বা নৈতিক। শিক্ষার লক্ষ্য আত্মার পূর্ণোৎকর্ষ দ্বারা বিশ্ববাসীর সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন এবং তদ্দ্বারা আত্মপ্রসাদ ও অনির্ব্বচনীয় আত্মানন্দ সম্ভোগ করা। একটী সুখের বস্তু পাইলে, প্রিয়জনের সহিত তাহা একত্রে ভোগ করিলে কত অধিক সুখ পাই।

শিক্ষার যখন "উত্তম সুখ"ই উদ্দেশ্য, তখন আমাদিগের মাতা, ভগিনী, দুহিতা-দিগকে উহা হইতে বঞ্চিত করিব কেমন করিয়া? তাঁহারা যে শিক্ষা চাহেন না এমন নহে। বরং অনেক স্থলে শিক্ষালাভ বিষয়ে তাঁহাদের আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক রমণী অন্যকে পড়িতে দেখিয়া ও বিদ্যালাভ করিয়া জ্ঞানগর্ভ কথা কহিতে শুনিয়া নিজ ভাগ্যকে দোষ দেন, কেহ কেহ বা কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়া বা বিজ্ঞানের সামান্য সামান্য বিষয় অবগত হইয়া জ্ঞানরাজ্যের কিঞ্চিন্মাত্র আভাস পাইয়া নিরতিশয় সুখানুভব ও জ্ঞানস্পৃহা প্রকাশ করেন। মানবজাতির মধ্যে, এমন কি প্রত্যেক সমাজের মধ্যে নারীর সংখ্যা লোকসংখ্যার অর্দ্ধেকেরও অধিক। আবার হতভাগ্য ভারতবর্ষে রমণীদের মধ্যে বিধবাও অনেক। চির-দুঃখপীড়িতা ভারতমাতার কত অসংখ্য বিধবা কন্যাগণ শোকে তাপে জর্জ্জরিতা হইয়া বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন ও নীরবে অহর্নিশ কত শোকাশ্রু মোচন করিতেছেন, মনে একবার ভাবিলে কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির প্রাণে দয়ার উদ্রেক না হয়?

ইহাঁদের জীবনভার লঘু করিবার অল্পই বিষয় আছে। তবে শিক্ষা দ্বারা ইহাঁদের মনকে জ্ঞানোপার্জ্জন ও অন্যান্য হিতকর বিষয়ে নিয়োজিত করিতে পারিলে তাঁহাদের দুঃখরাশির কিয়ৎ-পরিমাণে হ্রাস হয়। তবে কি তাহা সর্ব্বতো-ভাবে বাঞ্ছনীয় নহে? এমন মানুষোচিত দয়া-বিবর্জ্জিত পাষণ্ড কেহই নাই যে উহার প্রতিকূল হইবে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য "জন হার্শেল" একবার বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন,—"সংসারের সকলেই আমার প্রতিকূল হইলে, শোকে বিপদে অনভিভূত থাকি-বার জন্য, সর্ব্বাবস্থাতেই সুখ ও আনন্দের প্রস্রবণ স্বরূপ যদি কোনও বিষয় ভিক্ষা করিতে হয়, তবে "পাঠাদিতে রুচি" এইটাই ভিক্ষা করিব।" বিদ্যালাভের এমনই গুণ! অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, অন্তঃপুরস্থিত মহিলাদের জীবন আহারনিদ্রা বা নিকৃষ্ট চিন্তা ও কথোপকথনেই অতিবাহিত হয়। শিক্ষা এই সকল বিষয় হইতে তাঁহাদের মনকে উদ্ধার করিয়া অন্যান্য হিতজনক বিষয়ে নিয়োজিত করিতে পারে। শিক্ষা দ্বারা কর্ত্তব্যজ্ঞান সুন্দররূপে বর্দ্ধিত ও কর্ত্তব্যকার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। স্ত্রীশিক্ষা অশেষ মঙ্গলদায়ক। ইহার প্রশংসা

সম্যক্‌রূপে করা যায় না। একজন বিদেশীয় গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"একজন সুমাতা একশত শিক্ষকের তুল্য।" রমণীরা মাতা, স্ত্রী, দুহিতাদিরূপে সমাজকে শোভিত করেন ও আমাদের অশেষ সুখ বিধান করেন। যাঁহারা এখন অপ্রাপ্তবয়স্কা, তাঁহারা কিছুকালের মধ্যেই জীবনের গুরুতর ভার বহন করিবেন এবং পারিবারিক সুখ ও উন্নতির প্রসূতি হইবেন। অতএব ইহাঁদের শিক্ষা বহু বিস্তৃত ও পূর্ণরূপে প্রদত্ত হইলে সমাজের শ্রী আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে।

যখন ভারতের গৌরবের দিন ছিল, তখন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে লোকে উদাসীন থাকিতেন না। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ, কুমারসম্ভবাদি গ্রন্থে ও বৈদিক রমণী গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির বিবরণে পাওয়া যায়। লীলাবতী, খনা প্রভৃতি নামই বা কে না শ্রবণ করিয়াছেন? কিন্তু এখন জাতীয় গৌরবও বিলুপ্ত হইয়াছে এবং স্ত্রীশিক্ষাও চলিয়া গিয়াছে। কে বলিবে, আধুনিক পাশ্চাত্য জাতির উন্নতি অনেক পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষাসম্ভূত নহে? অতএব যাঁহাদের শিক্ষার এত প্রয়োজন, তাঁহাদের শিক্ষা বিষয়ে অমনোযোগী থাকা উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতসম্প্রদায়ের পক্ষে মহা লজ্জার কথা।

সম্প্রতি অন্তঃপুরবাসিনীদিগের শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করিতে অস্মদ্দেশীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছে। এ বিষয়ে নূতন কিছু বলিবার নাই, এবং কোনও নূতন উপায় উদ্ভাবন করাও অসম্ভব। তবে উহার উন্নতির বিষয়ে যে সকল উপায় সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করা যাইবে।

সম্প্রতি দেখা যায়, স্ত্রীশিক্ষার জন্য কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, তাহা এই :—

১ম—পড়িবার উপযুক্ত পুস্তক ও বিষয়।

২য়—ভাল ভাল বিদ্যালয় ও শিক্ষয়িত্রী।

৩য়—গৃহশিক্ষা—ইংরাজীতে যাহাকে "Home education" বলে।

যথাক্রমে এই তিনটী বিষয় পর্য্যালোচনা করা যাইবে।

অর্দ্ধশত বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা ভাষা ছিল, তাহা সভ্যজাতির ভাষাই নহে। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যে উহার যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা বোধ হয় কোনও ভাষার ইতিহাসে পাঠ করা যায় না। আমাদের ভাষার উন্নতি বড়ই আশাজনক ও প্রীতিপ্রদ। কিন্তু আমাদের ভাষায় ভাল পুস্তকের সংখ্যা অতি অল্পই—এমন কি, ভাল গ্রন্থকারদের নাম অঙ্গুলিদ্বারা গণনা করা যাইতে পারে। যে সকল পুস্তক আছে, তাহা হইতে উচ্চশিক্ষা লাভ হইতে পারে না। তবে তাহাতে "কাজ-চলা" শিক্ষা একরূপ হইতে পারে। কুরুচিবিবর্জ্জিত, নীতিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকের সংখ্যাও দিন দিন

বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি চিন্তাশীল ও কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণ বিদেশীয় ও সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বিজ্ঞান ও দর্শনাদি অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে পুস্তকের অভাব দূর হয় ও বঙ্গসাহিত্যেরও উন্নতি হয়। কিন্তু আজকাল নাটকাদির প্রাদুর্ভাব বড়ই বাড়িতেছে। এখনকার অধিকাংশ "ভুঁই-ফোঁড়" কবিদের কেবল সম্বল "চাঁদের হাসি", "কোকিলের কুহুধ্বনি", "প্রেমিকের দীর্ঘ নিঃশ্বাস" ইত্যাদি। আশ্চর্য্যের বিষয়, লোকেও ঐরূপ অসার ও জঘন্য পুস্তক ক্রয় করে ও পড়ে। যদি একটী কুকথা শুনিলে, কুদৃশ্য বা মন্দ ছবি দেখিলে আমাদের মনের ভাব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কলুষিত থাকে, তবে কুপুস্তক পাঠের যে কত বিষময় ফল, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। ডিস্‌রেলির গ্রন্থে একজন গ্রীক গ্রন্থকারের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি একখানি মন্দ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তদ্দারা সমাজের কত অহিত করিলেন ভাবিয়া অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়া শেষে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। কুপুস্তক পাঠে জ্ঞানলাভ হউক বা নাই হউক, অস্বাভাবিক মানসিক উত্তেজনা ও দুর্নীতি শিক্ষা বেশ হয়। ঐ সকল গ্রন্থের ভাব বিষবৎ রক্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া হাড়ে হাড়ে, মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়া ভাবের প্রস্রবণ সকলকে বিষাক্ত করে ও নৈতিক জীবন নষ্ট করে। চিকিৎসকেরা বলেন, কুপুস্তকপাঠে মন কলঙ্কিত হয় ও উত্তেজনা প্রযুক্ত স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও নারীদের হিষ্টিরিয়াদি দুরারোগ্য ভয়ানক ভয়ানক ব্যাধিও উৎপন্ন হয়। এই সকল কারণে বিশেষ ভাবে দেখা আবশ্যক যেন ঐ সকল পুস্তক কেহ না পড়ে ও কদাচই অবরোধের দ্বার ভেদ করিয়া রমণীদের হস্তে যাইতে না পায়। এই সকল কথা পড়িয়া সকল গ্রন্থকারের নিন্দা করিতেছি, কেহ যেন সিদ্ধান্ত না করেন। কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ বঙ্গভাষায় বিরচিত হইয়াছে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকই জঘন্য। অধিকাংশ লোকেই ঐরূপ গ্রন্থরচনায় ও পাঠে প্রবৃত্ত, ইহাও জাতীয় দুর্গতির পরিচায়ক। জীবনচরিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নীতি ইত্যাদি বিষয়ক কতকগুলি সুন্দর সুন্দর পুস্তক আছে। কতকগুলি সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্রও খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। কেবল কয়েকখানি পুস্তক পড়িলে বা "তিনি হন উপরে" ইত্যাদি জ্ঞানগর্ভ টীকা ও তাহার ইংরাজি বা একপাত অর্থনীতি পড়িলেই স্ত্রীশিক্ষা হইল না।

যাঁহারা গৃহের লক্ষ্মী ও প্রকৃতি, যাঁহাদিগকে ঈশ্বর আমাদের ধাত্রীরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের রন্ধন, গৃহস্থালী, শুশ্রূষা, শিশুপালন ও ধাত্রীবিদ্যা অন্ততঃ কিছু পরিমাণে জানা নিতান্ত প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত কিছু কিছু ভূগোল, ইতিহাস ও অঙ্ক জানা আবশ্যক। বালক ও বালিকা-

দের শৈশবাবস্থাতে বা তাহার পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত মানসিক ভাবের বা শারীরিক কোন বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না; সেইজন্য উভয়েরই শিক্ষা প্রথমতঃ বা অনেক দূর পর্য্যন্ত সাধারণ বিষয়ে এক প্রকারই হইতে পারে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহাদের বৈলক্ষণ্য জন্মে, তেমনি সেই সময় হইতে তাহাদের শিক্ষাও ভিন্ন প্রকার হওয়া উচিত। রন্ধন, গৃহস্থালী, শুশ্রূষা, শিশু-পালন, ধাত্রীবিদ্যা, সঙ্গীতাদি শিক্ষা করা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। প্রত্যেক মনুষ্যেরই আকৃতি ও রুচি ভিন্ন প্রকার; সেইজন্য ভাবাবিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার বিষয় ভিন্ন ভিন্ন থাকা আবশ্যক। রমণীদিগকে পুরুষাপেক্ষা শীঘ্র জীবনে প্রবিষ্টা হইতে হয়। অতএব জীবনে যাহা বেশী আবশ্যক, সেই সকল বিষয় তাঁহা-দিগকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। চিত্র-কার্য্য ও সূচীকার্য্যও শিক্ষা দেওয়া আব-শ্যক। ইংলণ্ডে স্থানে স্থানে রমণী-বিদ্যালয়ে "cooking class" আছে। তথায় রন্ধন করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। কেবল বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষার্থ ভাল ভাল পুস্তকের অভাব আছে বলিয়া ইংরাজী শিক্ষা করা দরকার। কিন্তু সামান্য ইংরাজীর অনুরোধে অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের জ্ঞান ও মাতৃভাষার অভিজ্ঞতা হারাণ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতে জাত প্রাকৃত ভাষা। অতএব বঙ্গভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে উহার মূলভাষা সংস্কৃতের সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক। ২য় বিদ্যালয় ইত্যাদি—বালকদের শিক্ষার্থে বিদ্যালয়ের যেমন প্রয়োজন অন্তঃপুরস্থা মহিলাদের শিক্ষার্থেও উহার তেমনিই প্রয়োজন। বিদ্যালয় ব্যতীত পৃথক্ পৃথক্ সুশিক্ষয়িত্রী পাওয়া দুর্লভ। আর বিদ্যালয়ে পাঠ করিলে সমপাঠিকাদের সহিত সহানুভূতি জন্মে এবং সময়ের মূল্য, নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে ও শিষ্টাচার শিক্ষা করিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বকালে যবনদের অত্যাচার হইতে রমণীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যে অবরোধপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অনেকস্থলেই স্ত্রীশিক্ষার প্রতিবন্ধকস্বরূপ। ঐ প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে বলিয়া অনেকে রমণীদিগকে বিদ্যালয়ে, বিশেষতঃ যেখানে পুরুষ শিক্ষক আছে এরূপ বিদ্যা-লয়ে জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য পাঠাইতে অনিচ্ছুক।

(ক্রমশঃ।)

ভূত না মানুষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কে কাহাকে এইরূপ ভাবে হত্যা করিল? নিশ্চয়ই কোন নৃশংস ঘৃণিত হস্তে অতিশয় কৌশলের সহিত এ কার্য্য সাধন হইয়া থাকিবে। তিনি দেখিলেন, আবেশভরেই যেন তাঁহার নেত্রদ্বয় নিমীলিত রহিয়াছে। ললাটে গভীর বিষাদ-রেখা অঙ্কিত, অথচ অধরে যেন এখনও হাস্যরেখা প্রকটিতই রহিয়াছে, যেন এখনো গণ্ডের প্রফুল্লতা দূরীভূত হয় নাই।

এই সাংঘাতিক ঘটনায় হতভাগ্য পথিকের সৌভাগ্য-নাট্যভূমে গভীর যবনিকা পতিত হইল। তিনি ক্ষণকাল বিমর্ষ হইয়া রহিলেন। অনন্তর ভগ্নীর মৃতদেহ শরীরের সহিত বন্ধন করিয়া অশ্বারোহণে চলিতে লাগিলেন। তখন আকাশে মেঘস্তরের ভিতর একটী মাত্রও শান্তোজ্জ্বল তারকা দেখা যাইতে ছিল না। পথিক চলিলেন, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ-আলোক তাহার পথ দেখাইতে লাগিল। তখন আর তাঁহার মনে সেই বালিকার সুন্দর মুখ এবং অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা কিছুই স্থান পাইতে ছিল না। এই অরণ্যের দেড় ক্রোশ অগ্রে এক কুটীরে কামিনী বাস করেন; তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরের দ্বার পথিকের জন্যই রাত্র দিন মুক্ত।

আমাদের পথিক এই কুটীরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শবদেহ বস্ত্রাবৃত ছিল। কুটীরবাসিনী রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি"?

পথিক একটী স্বর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া কুটীরবাসিনীর হাতে দিলেন।

রমণী—আমি আতিথ্য পালন করিয়া আপন কর্ত্তব্য পালন করি, কিন্তু কখনো কাহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করি না।

পথিক—আমি একটী কার্য্যের ভার আপনাকে দিব, তাহাতে কিঞ্চিৎ অর্থের প্রয়োজন হইবে, অতএব এ অর্থ আপনি গ্রহণ করুন।

রমণী বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

পথিক—এই বস্ত্রাবরণের মধ্যে একটী রমণীর মৃত দেহ রক্ষিত আছে।

মৃতদেহের কথায় রমণী কাঁপিয়া উঠিলেন।

পথিক কয়েকটী ঔষধের বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিলেন, এই সব ঔষধ ক্রয় করিয়া একটী তেল প্রস্তুত করিতে হইবে, ও সেই তেলের ভিতর এই মৃত দেহ ডুবাইয়া রাখিতে হইবে এবং এইরূপ করিলে মৃত দেহ সজীবের ন্যায় রহিবে।

আপাততঃ আমি একটী জরুরী কর্ম্মে গমন করিতেছি, কর্ম্মস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইহার সংকার করিব মনস্থ

করিয়াছি। রমণী প্রথমে পথিকের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, পশ্চাৎ তাহাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল, কারণ পথিকের মুখাবলোকন করা পর্য্যন্ত তাহার মনে একটী অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইতেছিল. যেমন কে তুমি কদম্বতলে কালীয়া কি কালিকা?

কুটীরবাসিনীর কুটীরের নীচে ছোট একটি গুপ্ত ঘর ছিল। রমণী মাটী খুঁড়িয়া একটি বৃহৎ প্রস্তর বাহির করিয়া গুপ্ত গৃহের দরজা মুক্ত করিয়া দিলেন, এবং পথিককে শব লইয়া আসিতে ইঙ্গিত করিয়া, স্বয়ং আলো লইয়া চলিলেন। পথিক মৃদু আলোর সাহায্যে সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে তাঁহারা সেই গুপ্তঘরে প্রবেশ করিলেন।

পথিক রমণীর ইঙ্গিতানুসারে শবদেহ ভূমিতলে রাখিয়া, ক্ষুন্ন মনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

সেস্থলে দেখিবার উপযুক্ত কিছুই ছিল না। ছিল কেবল দেওয়ালের গায়ে এক খানি চিত্রপট ঝুলানো। পথিক অনন্য মনে চিত্রপট খানি ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিবা মাত্র তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ভয়ে ও বিস্ময়ে তাঁহার বজ্রতুল্য কঠিন হৃদয় আলোড়িত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেই চিত্রপটের উপর একটী গোময়মণ্ডিত সংমার্জ্জনী সংলগ্ন রহিয়াছে। কিন্তু সে সব দেখিবার অথবা ভাবিবার আর তাঁহার সময় হইল না, ভগ্নীকে আর একটীবারমাত্র দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। তিনি শবদেহের বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিলেন, সেই সময় সেই স্থলে আর একটী ঘটনা সংঘটিত হইল। কুটীরবাসিনী রমণী পুনঃ পুনঃ শবদেহ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার দেহ কণ্টকিত হইল, চক্ষু স্থির হইল, হৃদয় কাঁপিতে আরম্ভ করিল এবং তিনি অচেতন হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন কিন্তু পথিকের যত্নে ও শুশ্রূষায় অল্পক্ষণে তাঁহার জ্ঞানলাভ হইল। পথিক তাহার নিকট বিদায় হইয়া শীঘ্রই গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন গন্তব্যস্থানে পঁহুছিলেন তখন প্রভাতের শীতল বায়ু বহিতেছিল। পথিক একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীকে প্রণাম করিলেন। গৃহস্বামীও ব্যস্ত হইয়া আপন আত্মীয় স্বজনের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহস্বামীর নাম ইন্দ্রমৌনী। পথিক ইন্দ্রমৌনীর নিকট আপন আগমন বার্ত্তা সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। সেই সঙ্গে পথের ঘটনাগুলিও আনুপূর্ব্বিক কহিলেন, কেবল তিনি যে সেই সুন্দরী বালিকার রূপে আপন মনটী হারাইয়াছিলেন, তাহাই গোপন করিলেন। পথিকের প্রমুখাৎ একটী ভীষণ সংবাদ শ্রুত হইয়া ইন্দ্রমৌনী ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন। পরে ক্রোধের প্রথম বেগ সম্বরণ হইলে অঙ্গারমধ্যস্থিত অগ্নিবৎ ঘন ঘন বায়ুরূপ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পথিকের

বদন মলিন হইলেও তেজঃপূর্ণ। তিনি ইন্দ্রমৌনীকে পুনঃ প্রণত হইয়া কহিলেন, "শীঘ্র উপস্থিত কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হউন। আর সময় নাই, কারণ পথিমধ্যে আমার অনেক সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা মহাশয়কে পূর্ব্বেই জ্ঞাত করাইয়াছি। পথিক এই বলিয়া পুনরায় অশ্বারোহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। তিনি দিন তিন রাত্রি ক্রমান্বয়ে পথ চলিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এ বিপদসঙ্কুল স্থানে বিশ্রাম করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। তৎকালে শ্রীপঞ্চমীর উৎসবে দেবী-গ্রামবাসিগণ উন্মত্ত ছিল। ফল্গুর লোহিত রঙ্গে দিগ্‌দিগন্ত অনুরঞ্জিত হইয়াছিল। দশজন বিশ্বাসী প্রতিবেশীকে সঙ্গে করিয়া ইন্দ্রমৌনীও রওয়ানা হইলেন। উর্দ্ধে জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি বিরাজিত অনন্ত আকাশ, নিম্নে নদ নদী বৃক্ষ বল্লরী ও অগণ্য জীব পরিপূর্ণ ভূতধাত্রী ধরিত্রী সকলে একত্র হইয়া সে সময় ইন্দ্রমৌনীর হৃদয়ে শত ধারায় বিষ বর্ষণ করিতেছিল।

ওঁ তৎসৎ

"ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ ॥
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥"

"পরহিতে ধন প্রাণ, যেইজন করে দান, তাহাকেই এ জগতে বুদ্ধিমান্ বলি।
চিরদিন এই ভবে, ধন প্রাণ নাহি রবে, সুকার্য্যে সঁপিলে তবে সার্থক সকলি ॥"

নিমতা সনাতন-ধর্ম্ম-সাধিনী সভা।

স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগান্তর্গত, মহাকালী পাঠশালার শাখা

নিমতা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের

সাহায্যার্থ আবেদনপত্র বা,

ভিক্ষা।

যথোচিত সম্মান পুরঃসর বিনীত নিবেদন—

মহাশয়, নিমতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী হিন্দু সাধারণকে সনাতন ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইতে শিক্ষা দান, এবং তৎসাধনভূত যাবতীয় বৈধ ও সাধারণ লোকহিতকর কার্য্যের যথাসাধ্য অনুষ্ঠান ও সহায়তা করণোদ্দেশে উল্লিখিত সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উক্ত উদ্দেশ্য সাধন জন্য, এই সভা বিভিন্ন বিভাগ সকলে বিভক্ত থাকিবার নিয়ম আছে। যথা:—সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা, শাস্ত্র শিক্ষা, নীতি শিক্ষা,

সদুপদেশ দান ও নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজের বৈধ মঙ্গল সাধনে সহায়তার জন্য তত্ত্ব-বিভাগ; সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির জন্য সাধারণ-শিক্ষা-বিভাগ; চিকিৎসালয় স্থাপন, স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন, দীন দরিদ্র ও অনাথ ব্যক্তিদিগকে ঔষধ পথ্যাদি দান প্রভৃতি জন্য স্বাস্থ্য-বিভাগ; শিল্পাদির উন্নতির জন্য শিল্প বিভাগ; বালিকাগণকে সম্পূর্ণ হিন্দু ভাবে সুশিক্ষা দান জন্য স্ত্রী শিক্ষা বিভাগ; প্রভৃতি।

এই সভায় স্বদেশানুরাগী ও স্বধর্ম্ম-পরায়ণ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ও সকল শ্রেণীর লোকের জন্যই যথা-যোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং সকলেরই স্ব স্ব অভিরুচি মত বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া কার্য্য করিবার সুবিধা ও অধিকার আছে। স্ত্রীলোকগণ কেবল স্ত্রীশিক্ষা বিভাগে সভ্যা হইবেন, এবং বিভিন্ন বিভাগ সকল, সভার মস্তক স্বরূপ তত্ত্ববিভাগের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিবেন; সভার গঠন এইরূপ।

বাঙ্গালা ১৩১৪ সালের ২২এ অগ্রহায়ণ তারিখে উক্ত গ্রামে এই সভার মূল স্বরূপ তত্ত্ব-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কিছু দিন পরে ১৩১৫ সালের ২রা শ্রাবণ তারিখে উক্ত তত্ত্ববিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে কতকগুলি গ্রাম্য ভদ্র মহিলা সমবেত হইয়া একটী স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগ গঠিত করেন। এবং আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে সর্ব্ব সাধারণকে জানাইতেছি যে তাঁহাদের আগ্রহে ও যত্নে এখানে "নিমতা হিন্দু-বালিকা বিদ্যালয়" নামে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দু মহিলাগণের সাহায্যে, সম্পূর্ণ হিন্দু ভাবে, হিন্দু বালিকা শিক্ষার উপযোগী এরূপ বিদ্যালয়, ভারতে এক অভিনব সামগ্রী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই অধঃপতিত আর্য্য জাতির ও ভারতের অতীত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, ভারতরমণীগণকে জগতের আদর্শ রমণীরূপে সুশিক্ষিত করা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, একথা বোধ হয় কোন শিক্ষিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। তদ্ভিন্ন, পুরুষগণের কার্য্যভার যেরূপ গুরুতর ও বিস্তৃত, তাহাতে রমণীগণ তাঁহাদের কন্যাগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলে, তাহা যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, তাহা বলা যায় না। আর্য্য নারীর হৃদয় স্বভাবতঃ অতি পবিত্র এবং দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, পরোপকার প্রভৃতি বহুবিধ সদ্‌গুণরাশির আধার; তাহাতে আবার তাঁহাদের ধর্ম্মাত্মা ও সদ্‌বুদ্ধি সম্পন্ন পতি পুত্রাদিগণের উৎসাহ ও আনুকূল্য পাইলে, অচিরে যে তাহা সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া, অতি মনোহারিণী শোভা ধারণ ও দেবগণ-মনোহর সুবিমল পরিমলে জগৎ আমোদিত করিয়া ফেলে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রধানতঃ গ্রামবাসিনী কয়েকজন ভদ্র মহিলার সাহায্যে বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইলেও, গ্রামবাসিনী সাধারণ রমণীগণ অধিকাংশই দরিদ্রা। তদ্ভিন্ন, বালিকা-

দিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। উহার নিজস্ব একটী গৃহ নাই। তদুপরি শিক্ষকদিগের বেতন, বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ ও অন্যান্য বিশেষ আবশ্যকীয় অনেক ব্যয়াদি আছে। এরূপ অবস্থায়, কেবল মাত্র গ্রামবাসিনীগণের সাহায্যে বিদ্যালয়টী রক্ষিত হওয়া একান্ত অসম্ভব। সেইজন্য আমরা আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির শরণ লইতে বাধ্য হইলাম। সৎকর্ম্মে সাহায্য দান, পুণ্যসাপেক্ষ। উহা কখনই যে কোন ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। বিদ্যালয়টী রক্ষার জন্য যথোচিত মাসিক সাহায্য এবং উহার গৃহ নির্ম্মাণ জন্য অন্যূন ১৫০০ দেড় সহস্র টাকার আবশ্যক অনুমান করা হইয়াছে। অতএব একান্ত ভরসা, আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি, এবম্বিধ মহৎ কার্য্যে আপনার পরিবারভুক্ত মহানুভব রমণীগণের গৌরববর্দ্ধক ও তাঁহাদের মহীয়সী দেবী প্রকৃতির পরিচায়ক, উপযুক্ত বদান্যতার পরিচয় দর্শাইতে কখনই বিরত হইবেন না।

সভার স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগের প্রচারিত উক্ত বিভাগীয় সম্পাদিকার স্বাক্ষরিত মুদ্রিত স্বতন্ত্র আবেদন পত্র ও সভার বিগত বর্ষের কার্য্য-বিবরণী পুস্তিকা জননী সমীপে পাঠার্থ ছাপান হইয়াছে। এবং আমরাও আজ তাঁহার অবোধ সন্তানের ন্যায় কাতর ভাবে, মায়ের নিকট, আমাদের অমূল্য বিদ্যালয়টীর রক্ষার জন্য ক্রন্দন করিতেছি। স্বভাব-করুণ-বিগলিত হৃদয়া মা, রমণীকুলের গৌরব বৃদ্ধিকর আমাদের এমন সুসঙ্গত আবদারে কর্ণপাত করিবে না কি? মা, শাস্ত্রে তোমায় সাক্ষাৎ ভগবতীরূপা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। মা, তোমার অনন্ত কোটি সন্তানকে তুমি অকাতরে চতুর্ব্বর্গের ফলদানে পরিতৃপ্ত করিয়া থাক, আর মা, আমাদের এই ক্ষুদ্র বাসনা পরিতৃপ্ত করিবে না? না, তাহাত কখনই হইবে না! আমরা ত মা, কিছুতেই শুনিব না! মা, তুমি ইচ্ছাময়ী, তোমার ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে, অবিশ্বাসীর নিকট ইহা মিথ্যা হইলেও, আমাদের নিকট ইহা জলন্ত সত্য। সত্যের পরীক্ষা উপস্থিত, দেখিব মা, তোমার ইচ্ছা কি। সন্তানের আবদার তুমি শুনিবে কি না!! তুমি যথার্থই দয়াময়ী মা কি না!!! ইতি

একান্ত বশম্বদ,

শ্রীহরিকুমার রায় চৌধুরী (সম্পাদক)

মহাজন-চরিত, জন ফ্রেডরিক ওবার্লিন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বন্ধুর পর্ব্বত গাত্রোপরি অবস্থিত এই গ্রামে প্রায় এক শত ঘর গৃহস্থ বাস করিত। পর্ব্বতশ্রেণীর পার্শ্বদেশ অতি দুরারোহ। তথা হইতে বারিস্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইত, এবং তৎসঙ্গে জীব সকলকে ভাসাইয়া লইয়া মৃত্যুকবলে নিক্ষেপ করিত। তুষাররাশি পুঞ্জীকৃত হইয়া কখনও সেই প্রস্তরময়ী ভূমিকে কঠিন আবরণে আবৃত করিত, কখনও বা উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া সম্মুখস্থ প্রদেশ ভাসাইয়া লইয়া যাইত। প্রায়ই পর্ব্বত-গাত্র হইতে প্রস্তরাদি সহিত মৃত্তিকাস্তূপ সকল স্থানচ্যুত হইয়া পড়িত। গ্রামে পথ ছিল না বলিলেই হয়। যাহাও ছিল, তাহাও সংস্কারাভাবে শোচনীয় দশাপন্ন এবং শীতকালে একেবারে অগম্য হইত। ষ্ট্রাসবর্গ নগর তথা হইতে ১৩ ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী হইলেও তথায় গমনাগমন মহা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। গ্রামবাসিগণ নিতান্ত দারিদ্র্য ও অলস স্বভাববশতঃ অনেক সময় খাইতে পাইত না। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে ষ্টুবার তথাকার ধর্ম্মোপদেশক নিযুক্ত হন। তিনি তথায় আসিয়াই স্থানীয় বিদ্যালয়ের তত্ত্ব লইলেন এবং বিদ্যালয়ে গিয়া দেখিলেন যে হীনবেশ ও মলিনদেহ কতকগুলি বালক একটী জঘন্য গৃহে বসিয়া গোলমাল করিতেছে।

"ইহাদের শিক্ষক কে?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার সহচরেরা সেই গৃহের কোণে শয়ান এক দীন বৃদ্ধের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। ষ্টুবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনিই কি শিক্ষক?" উত্তর। "হাঁ মহাশয়।"

ষ্টুবার। "আপনি বালকদিগকে কি শিক্ষা দেন?"

শিক্ষক। "কিছুই না মহাশয়"।

ষ্টুবার। সে কি, কিছুই শিখান না?

শিক্ষক। "আজ্ঞে, আমি যে নিজেই কিছু জানি না।"

ষ্টুবার। তবে শিক্ষক হইলেন কিরূপে?

শিক্ষক। "আজ্ঞা, পূর্ব্বে আমি এই গ্রামে শূকর চরাইতাম, কিন্তু বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া সে কার্য্যে অক্ষম হওয়াতে গ্রামবাসিগণ আমাকে আপনাদের সন্তান-গণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছেন।"

ওয়াও বাস গ্রামে আসিয়া ওবার্লিন এক ভগ্ন গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিন চারিটী প্রকোষ্ঠ ছিল এবং সম্মুখে কয়েক হস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র একটী উদ্যান ছিল। তিনি অবিলম্বেই স্বীয় যজমানগণের সহিত পরিচিত হইলেন এবং তাহাদের ঘোর দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতা দেখিয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। ইহাদের মধ্যে এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের দশটী সন্তান ছিল। কিন্তু তাঁহার এমন

সঙ্গতি ছিল না যে তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকে এক এক যোড়া চর্ম্মপাদুকা ক্রয় করিয়া দেন। কেবলমাত্র ৫ যোড়া কাষ্ঠ পাদুকা ছিল। তাহাই তাহারা পর্য্যায়ক্রমে পরিধান করিত। সুতরাং অবশিষ্ট পাচ জনকে সেই শীতপ্রধান দেশের বরফাবৃত স্থানে রিক্তপদে বিচরণ করিতে হইত। গ্রামবাসিদিগের মধ্যে যাহারা নিতান্ত দরিদ্র ছিল, তাহারা অপর খাদ্যাভাবে তৃণ বা মূল সিদ্ধ করিয়া আহার করিত। এইরূপে ক্ষুধার জ্বালায় কত লোক বিষাক্ত উদ্ভিদ না জানিয়া ভোজন করিয়া প্রাণত্যাগ করিত। পূর্ব্ববর্ত্তী একজন ধর্ম্মযাজক সেই গ্রামে প্রথমে আলুর চাষ প্রচলিত করেন। কিন্তু গ্রামবাসিগণ কৃষিকার্য্যের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি না জানাতে, সে আলু ক্রমে নিকৃষ্ট ও অখাদ্য হইয়া উঠে। উৎপন্ন আলুর পরিমাণও অতি অল্প হইত। ওবালিন নগর হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় আলুর বীজ আনয়ন করিলেন এবং উপযোগী সার প্রয়োগাদি দ্বারা ভূমির উৎকর্ষ সাধনের উপায় ও বীজের উৎকৃষ্টতা রক্ষার কৌশল শিক্ষা দিয়া কৃষকদিগকে যথেষ্ট সুন্দর আলু উৎপাদন করিতে শিখাইলেন। সে গ্রামের বালুকাপ্রধান ভূমি ঐ চাষের বিশেষ উপযোগী হওয়াতে এত অধিক আলু জন্মিতে লাগিল যে তত্রত্য লোকের সর্ব্বপ্রকার অভাব পূরণ করিয়া অনেক পরিমাণ উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল। তখন প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত আলু কিরূপে ষ্ট্রাসবর্গ নগরে বিক্রয় করিয়া প্রজারা লাভবান্ হইতে পারে, ওবালিনের মনে এই চিন্তা উদিত হইল। কিন্তু ষ্ট্রাসবর্গ নগরে যাতায়াত কিরূপ দুঃসাধ্য ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এমন কি শীতের কয়েক মাস প্রায়ই লোকের এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাওয়া আসা অসাধ্য হইত। ইহার প্রতিবিধানার্থ ওবালিন প্রথমেই প্রস্তর সমূহ দ্বারা পথ বাঁধাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ষ্ট্রাসবর্গ পর্য্যন্ত একটী ভাল রাস্তা হইলে কত দূর সুবিধা হইবে, ইহা প্রজাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য তিনি বলিলেন,—"দেখ রাস্তা না থাকাতে তোমরা বৎসরের মধ্যে ছয় মাসেরও অধিক কাল তুষারবৃষ্টির উৎপাতে নিজ নিজ গ্রামে অবরুদ্ধ হইয়া থাক। কিন্তু এই রাস্তা নির্ম্মিত হইলে তোমরা নিজ নিজ উৎপন্ন দ্রব্য অনায়াসে অন্য স্থানে বিক্রয় করিতে পারিবে, এবং নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহের সহিত তোমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। এখন তোমরা কত প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে কষ্ট পাও। ষ্ট্রাসবর্গ ও মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য জনপদে সে সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও গমনাগমনের অসুবিধাপ্রযুক্ত তাহা পাও না। ভাবিয়া দেখ এই পথ প্রস্তুত হইলে তোমরাও তোমাদের সন্তানগণ কত প্রকারে সুখী হইতে পারিবে।" কিন্তু ওবালীনের এইরূপ উপদেশ কার্য্যকর হইল না, গ্রামবাসিগণ অনভিজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার পরামর্শে কর্ণপাত করিল না। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

মহিলা উকীল—মিস্ বি, এ, ইঞ্জিনীয়ার নাম্নী একটি পার্শী মহিলা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারশাস্ত্রের পরীক্ষায় এল, এল, বি উপাধি লাভ করিয়াছেন। এ অঞ্চলে ইনিই সর্ব্বপ্রথম ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলেন। মিস্ এঞ্জিনীয়ার এম, এ, পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণা। মিস্ কর্ণেলিয়া সোরাবজীর নাম বোধ হয় অনেকেই জানেন, ইনিও বহুদিন পূর্ব্বে বিলাতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। কিন্তু ব্যারিষ্টারী করিবার সম্মতি পান নাই।

ভারতের বিখ্যাত কহিনুর হীরক এক্ষণে ইংলণ্ডের রাজমুকুটের শোভা সম্পাদন করিতেছে এ সংবাদ সকলেই অবগত আছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকার হীরকখনি হইতে এক সুবৃহৎ ও উৎকৃষ্ট হীরক পাওয়া গিয়াছিল। খনির সত্বাধিকারী মহাশয় আমাদের মৃত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডকে হীরকটী উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। এই হীরক এতদিন কার্লীনানা নামে পরিচিত ছিল, পৃথিবীতে উহার ন্যায় বৃহৎ ও নির্ম্মল হীরক আর দেখা যায় নাই। মৃত সম্রাটের আদেশে এক্ষণে এই হীরকটীকে দুই খণ্ড করা হইয়াছে। উহার বৃহৎ অংশ "সেপটার" বা রাজদণ্ডে খচিত হইয়াছে। এবং অন্য অংশটী কহিনুরের সহিত রাজমুকুটের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। মৃত সম্রাট্ এই নূতন হীরকমণ্ডিত মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান সম্রাট্ দীর্ঘকাল এই মুকুট মস্তকে ধারণ করুন এই আমাদিগের বাসনা। এই হীরকের বর্ত্তমান নাম হইয়াছে আফ্রিকার তারা (Star of Africa)।

কলিকাতায় ওড়া কল—কলিকাতায় ওড়া কলের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সর্ব্ব প্রথম পরীক্ষার দিন মিসেস্ এন্ সি সেন (রাণী মৃণালিনী) উড়িয়াছিলেন।

সৎকার্য্যে নারী-নিয়োগ—ফরাসী দেশের সামরিক বিভাগে একজন ফরাসী স্ত্রীলোক মূর্খ সৈন্যদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। একার্য্যে ইনিই প্রথম নিযুক্ত হইলেন।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে কারুশিল্প—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে হস্তনির্ম্মিত কারুশিল্প কত আছে, ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্ট তাহার একটী বিশ্বাসযোগ্য তালিকা সংগ্রহের প্রস্তাব করিয়াছেন।

সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র সম্প্রতি বিলাতে ভারত-সচিব লর্ড ক্রুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বিলাতে ও আমেরিকায় ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সুনীতি কলেজ ও পরীক্ষার ফল।

বিগত দুই বৎসর হইতে আমাদের মাননীয়া কুচবেহার মহারাণীর অভিপ্রায়ানুসারে সুনীতি-কলেজে নূতন প্রণালীতে শিক্ষাদান চলিতেছে। পূর্ব্বে শিক্ষাবিভাগের বিভাগীয় পরীক্ষানুযায়ী বিষয়সমূহ শিক্ষা দেওয়া হইত। বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা একই ছিল। বর্ত্তমানে নূতন প্রণালীতে বালিকাদিগের শিক্ষোপযোগী বিষয় সকল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কুচবেহার কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তক ও অপরাপর শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এই নূতন প্রণালীতে সুনীতি কলেজে এখন ইংরাজী-বাঙ্গালা উচ্চ প্রাথমিক ষ্টাণ্ডার্ড ও ইংরাজী-বাঙ্গালা নিম্ন প্রাথমিক ষ্টাণ্ডার্ড পরীক্ষা নামে দুই প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসে উভয়বিধ পরীক্ষা গৃহীত হইয়া নিম্নলিখিত বালিকাগণ পরীক্ষায় খুব ভালরূপে উত্তীর্ণা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত আশা ও উৎসাহজনক যে পরীক্ষাস্থানে যে নয়টী বালিকা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছে।

পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগের নাম।

কুমারী শৈলবালা সেন
" সরযূবালা গুপ্ত
" সুকুমারী সাহা
" চারুবালা দেবী
কুমারী কিরণবালা সরকার
" গিরিবালা রায়
" লক্ষ্মীময়ী দেবী
" নলিনীবালা দাস
" কিরণবালা দাস গুপ্ত

যে বালিকাটী নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, সে মাসিক দুই টাকা হিসাবে দুই বৎসর বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে।

সুনীতি কলেজে নূতন প্রণালী অনুযায়ী মধ্য ইংরাজীর সমস্থানীয় শ্রেণী এখনও খোলা হয় নাই। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে নিম্নলিখিত তিনটী বালিকা প্রাইভেট শিক্ষা লাভ করিয়া বিভাগীয় পরীক্ষার সঙ্গে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে।

পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগের নাম।

কুমারী খনা নাইটিঙ্গেল মজুমদার
" ঊষাবালা সেন
" চারুবালা সেন

উপরোক্ত তিনটি বালিকার মধ্যে কুমারী খনা নাইটিঙ্গেল সমস্ত কুচবেহারের মধ্যে বালকদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। কুচবেহারে দিন দিন স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয় ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। মহারাজা ও মহারাণী এ শিক্ষায় খুব পক্ষপাতী ও মুক্তহস্ত।

বামারচনা।

বাসনা।

বাসনা সতত মনে আত্মীয় স্বজন-গণে
পড়ুন লুটায়ে তব সুধাস্নিগ্ধ পদে,
পাপে, তাপে, প্রলোভনে, রোগে, শোকে, দুরদিনে,
জুড়ান সে শান্তি-স্বর্গে সম্পদে বিপদে।
মম দেশবাসিগণ চিনিয়া অনন্ত ধন
ব্রহ্ম-অগ্নি মন্ত্রপূত হো'ন জনে জনে,
কর্ম্মক্ষেত্র তীর্থ যত হোক পুণ্য, হোক পূত,
হো'ক পূর্ণ মনোরথ প্রেমের মিলনে।
পরাণের অতি প্রিয় সমাজে অস্পৃশ্য হেয়
ভাই-বোন অপ্রমেয় অজ্ঞান ভেদিয়া,
প্রেম-ভকতিতে ভরি জয়ী হোন সর্ব্বোপরি
তুমি যে দীনের বন্ধু, তোমারে পূজিয়া।
বিশ্ববাসী ভ্রাতা ভগ্নী পরি হৃদে প্রেমমণি
ভুলে যান রণতৃষা অতি তুচ্ছ ক্ষুধা,
একের প্রেমেতে গলে একের(ই) সন্তান বলে
পরস্পর প্রীতিদানে জুড়ান বসুধা।
বিশ্বপ্রেমে কন্যাপুত্র হয়ে আহা সুপবিত্র
কালেতে সঁপুক পদে তরুণ যৌবন
তোমার(ই) সেবাতে ভবে যাচুক জীবন সবে
তোমারি অমৃতে বিভো! হোক নিমগন।
যে যে কাজে যায় যাক বিশ্বে ব্রহ্ম নাম গাক
ব্রহ্মগুণ-পরিমলে ভরুক ভুবন,
ধরম-প্রচার কিম্বা করুক স্বদেশ-সেবা
যতী, ভিক্ষু, গৃহস্থ বা ভক্তি সার ধন।
যাহাদের পুণ্য স্মৃতি নিয়ত ঢালিছে প্রীতি
মরমে রেখেছে ভরি বিমল সৌরভে,
পবিত্র যে পুষ্পসবে তুমি প্রভো! প্রীত হবে
ভাবিয়া অঞ্জলি দি'ক আনন্দে-গৌরবে;
জীবন-তরুর ফুল স্বর্গস্থ সে শিশুকুল
অর্ঘ্যাসম পরশি ও চরণপল্লবে,
নব বিকাশেতে ভরি হাসিয়া উঠুক হরি!
তোমা হেরি তুচ্ছ করি বিচ্ছেদ-বিপ্লবে।
কোমল সে হিয়াগুলি আহ্লাদে আপনা ভুলি
সাধুক তোমার(ই) প্রীতি-ভকতিতে গলে,
বিপন্ন সে আত্মাকুলে সেবুক হৃদয় খুলে
স্বর্গীয় দূতের সম বিজনে বিরলে।
স্নেহেতে ভরুক স্বর্গ পুলকিত পিতৃবর্গ
যত মম দেবতারা হউন সম্প্রীত,
সবাকার আশীর্ব্বাদে নাথ, তব পরসাদে
(ভক্ত শিশুমণি ধ্রুব-প্রহ্লাদের মত)
অহেতুকী ভকতিতে হউক প্লাবিত।
বাসনা—পতির সনে প্রণমি ও শ্রীচরণে
দুইটী মিলিত নদী সাগর সঙ্গমে,
জাহ্নবী যমুনা মত বয়ে যাই অবিরত
চরম গতির পানে প্রশান্ত মরমে!
গৃহ হোক পুণ্য স্বর্গ প্রেম ভক্তি তীর্থবর্গ
রাজুক তাহার ক্রোড়ে তোমা হৃদে ধরে,
সে অমৃত শিশুগণ ভোগ করি অনুক্ষণ
ফুটিয়া উঠুক তব নৈবেদ্যের তরে।
আরো সাধ উঠে জেগে সম্মিলিত অনুরাগে

সোদর-সোদরা সবে গাহি তব গাথা,
যেথানে যাইনা আমি ওই নাথ শুনি স্বামী
সবে মোর তব প্রেমে হোক মাথামাথা।
নিজে সূর্য্যমুখী সম ওগো, প্রেমরবি মম
তব পানে চাহি যেন প্রতিক্ষণ রই,
তব প্রীতি মোর স্বর্গ, তব প্রীতি চতুর্ব্বর্গ
জানিনা যেনগো আর তব প্রীতি বই।

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

প্রার্থনা।

(১)

প্রণমি তোমারে দেব! অজ্ঞাত সুন্দর,
জগত নমিছে পদে যুগ যুগান্তর।
সকল পৃথিবী শুদ্ধ,
তোমার নামেতে স্তব্ধ
তুমি নাকি সবাকার প্রাণের ঈশ্বর,
প্রণমি তোমারে দেব! অজ্ঞাত সুন্দর।

(২)

নমামি তোমারে বিভু অনন্ত মহান্,
জলে, স্থলে, গৃহে, বনে, তুমি বিদ্যমান।
সংসারে সারের সার,
তুমি ব্রহ্ম নিরাকার,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, তোমার বাখান,
কি বলিব? দেব! তুমি অনন্ত মহান্।

(৩)

নমি আমি তব পদে ত্রিলোক প্রধান!
সমগ্র মানবজাতি তোমার সন্তান।
তোমাতে পাতাল ক্ষিতি,
তুমি স্বর্গ, তুমি স্থিতি,
তোমাতে প্রলয় সৃষ্টি, তুমি মহাপ্রাণ,
সকলি তোমাতে, তুমি ত্রিলোকপ্রধান।

(৪)

বন্দনা করিহে তোমা প্রভু ভগবান্,
আমার হৃদয়ে তুমি হও অধিষ্ঠান।
তুমি আমি নহি পর,
তুমি মম প্রাণেশ্বর,
প্রতিষ্ঠিত হও হৃদে ওহে শক্তিমান্!
বন্দনা করিহে তোমা প্রভু ভগবান্!

(৫)

এই ভিক্ষা মাগি পদে অখিলের স্বামী!
তোমাতে ডুবিয়া রই যেন সদা আমি।
তোমারে হৃদয়ঙ্গম,
করিতে যে শক্তি মম
আবশ্যক, মোরে তাহা দান কর তুমি,
ভিক্ষা পূর্ণ কর মম অখিলের স্বামী!

শ্রীসরযূ সেন।

নবজাত শিশুর প্রতি।

সুন্দর প্রভাতকালে স্বরগের দ্বার খুলে
নেমে এল ধরাতলে একটী রতন।
অমর নগর হতে শোকতপ্ত সংসারেতে
এলি যদি আয় তবে সাধনার ধন!

প্রস্ফুটিত পদ্ম সম মুখ তব নিরুপম
স্বর্গীয় ভূষণে অঙ্গ ভূষিত তোমার।
হীরা মণি দূরে ফেলে তোমারে, লইব কোলে
এর চেয়ে সুখ বাছ! কি আছে আমার?
দেব-আশীর্ব্বাদী ফুল ধরাতলে নাহি তুল
কি দিয়ে উপমা দিব! বকুল তোমারে।
নাহি জান হিংসা-দ্বেষ নাহি মলিনতালেশ
হাসিয়া হাসিয়া সুখী করিছ সবারে।
আজি এ আনন্দ দিনে বড় প্রফুল্লিত মনে
দিতেছি এ উপহার বকুল! তোমায়।
কিবা দিব আমি আর এ ক্ষুদ্র স্নেহের হার
সাদরে বকুল! তুমি পরিও গলায়।
জগদীশ! তব পদে এই নিবেদন,
তোমারি প্রসূনে তুমি রক্ষ অনুক্ষণ।

আশীর্ব্বাদিকা—মাসিমা।

কুমারী অমিয়া গুপ্ত।

সত্য না স্বপন!

যেন কোন স্বপনের ঘোরে
দেখিলাম মেলিয়া নয়ন,
নিরজন উপবন মরি কিবা সুশোভন
যেন কি অমৃত সরে ভাসিল জীবন।১।
কুসুম-কলিকা থরে থরে
ফুটি সেই কানন-ভিতরে
মৃদুল পবনে হাসি ছড়ায়ে সৌরভরাশি
শান্তির অমিয় ধারা ঢালিল অন্তরে।২।
মৃদুমন্দ বহে সুশীতল
মধুময় মলয় অনিল।
মুকুলিত বৃক্ষোপরে হরষে পঞ্চম, স্বরে
গাহিল একত্রে শত সহস্র কোকিল।৩।
দেখিলাম স্বর্ণফুল প্রায়
শোভে তারা আকাশের গায়
সমুদিত পূর্ণশশী হাসিয়া কৌমুদী হাসি
বিধৌত করিছে ধরা রজত ধারায়।৪।
সপ্তস্বরে সুললিত গান
জগত জাগায়ে দিল তান।
সে গান শুনিয়া হায়! কত সুধা বয়ে যায়
শিহরি উঠিল তায় এ নির্জীব প্রাণ।৫।
দেখিলাম যেন দেববালা
গলে দোলে মণিময় মালা।
বক্ষেতে রয়েছে তার চারু শশী সুকুমার
স্বরগের সুধা কত চাঁদমুখে ঢালা।৬।
সেই ধনে আপনার বলে
তুলিয়া নিলেম হায় কোলে
না হ'তে পূরণ সাধ রমনী সাধিল বাদ
কেড়ে নিল ভাসাইয়া নয়নের জলে।৭।
ফুরাইল সুখের স্বপন,
লুকাইল কুসুমকানন।
নাই কোকিলের তান, নাই সে ললিত গান
নাই আর সুবিমল মলয় পবন।৮।
অস্তগত সুখের তপন
মেঘে ঢাকা হৃদয়-গগন।
জলবুদ্বুদের প্রায় মুহূর্ত্তে লুকালো হায়!
ভাবি তাই একি সত্য অথবা স্বপন।৯।
এক বর্ষ গিয়াছে ত চলে'
তবে কেন মরমের তলে

সে মুখ পরাণে আসে সে হাসি মরমে ভাসে
কেন হই আত্মহারা সে ভাবনা-বলে।১০।
একা আমি এসেছি ত ভবে,
তবে কেন সে আমার হবে?
তবে কেন তারি তরে ভাসি নয়নের নীরে
সেই ঢেউ হৃদয়েতে কেন বহে তবে?১১।
এখনও আছে হৃদে আঁকা
সে অতীত স্বপনের লেখা।
যেন প্রভাতের রবি ডগমগ লাল ছবি
আঁধার জলদে যেন বিজলীর রেখা।১২।
ভুলি নাই সে বিধুবদন
ভুলিব কি থাকিতে জীবন?
তথাপি সন্দেহ ঘোর কেন রে কাটেনি মোর
না পারি বুঝিতে একি সত্য না স্বপন।১৩।

শ্রীমনোরমা দেবী।

ব্যথিতা।

(১)

কত যুগ চলি গেছ তুমি—
মনে হয় সে দিনের কথা,
সেই বেল ফুল হাসি, ঢালিত সৌরভরাশি
মলয় পবনে সেই
কত মধুরতা!

(২)

মনে পড়ে—কত মধুমাখা
ছিল এই মাটির ধরণী,
প্রাণে ছিল সুখ শান্তি, নরদেহে দেবকান্তি,
বিশ্বব্যাপী ছিল সদা
বিশ্বের জননী।

(৩)

সে দিনে তো বুঝি নাই কভু
হেন দিন রবেনা আমার.
বুঝি নাই এই স্মৃতি, নির্জনে জপিব নিতি
অভাগীর অমানিশা
পোহাবেনা আর।

(৪)

আজি তুমি আছ কোন খানে
উজলিয়া চাঁদের কিরণ.
আমি যে তোমার লাগি যুগ যুগ আছি জাগি
জাগ্রত নয়নে দেখি
সে শুভ স্বপন!

(৫)

তোমা বিনা আজি ধরাতল,
শুধু জরা-মরণের দেশ,
শত বিভীবিকাময়, সতত ভাবনা-ভয়,
তোমা বিনা নাহি হেথা
আরামের লেশ।

(৬)

তুমি যদি না আসিলে ফিরে,
একা আর পারিনা থাকিতে,
হেথা যে কিছুই নাই, আছে শুধু ভস্ম ছাই,
এমন নিঠুর এরা
তা' যদি জানিতে!—

(৭)

আমি কত লাঞ্ছিতা দলিতা
অনাদৃতা সংসারের আজি—
তা' যদি জানিতে কভু স্বর্গবাস ছাড়ি তবু
আসিতে করুণাময়,
বীরবেশে সাজি!

(৮)

বোঝনা'তো কি ব্যথিতা আমি
কেমনে ভাঙিছে ভাঙা বুক,
তথাপি যে আছি প্রাণে, সে শুধু তোমারি ধ্যানে,
মানস মন্দিরে পূজি
ও পবিত্র মুখ।

(৯)

বড় সাধ—আর একদিন
বড় সাধ—আর একবার,
তেমনি শ্যামল সাঁঝে, নীরব নিরালা মাঝে,
মিশাইয়া হাসি-অশ্রু
প্রীতি-তিরস্কার—

(১০)

মরমের লুকানো বেদনা
যেন তা' বলিতে পারি সব—
তাও কি কখনো হবে, কেই বা সে কথা কবে
অ-দৃষ্ট অদৃষ্ট লিপি
দেবতা নীরব!

শ্রী "বীরকুমারবধ"-রচয়িত্রী।

মহাপ্রয়াণ।

(পূজ্যপাদ শ্বশুরমহাশয়ের স্বর্গযাত্রা উপলক্ষে)।

(১)

আহা মরি! মরি! প্রকৃতি সুন্দরী,
সেজেছে কেমন প্রাণ মন-লোভা,
তারকাখচিত নীলাম্বর-শাড়ী,
পরিধানে আহা! হেরি কত শোভা।
আসিবেন দেবী বরষের পরে,
ভকতসন্তান সকলের ঘরে,
হেরিতে মায়েরে এ আশে সবাই
হয়েছে পুলকে ভোর।

(২)

দেবীসমাগম, বারতা প্রচারি,
বাজিছে বাজনা মধুর নিক্বণে,
যে পারে যেমন, সাজে মনোরম,
করে ছুটাছুটী প্রফুল্ল আননে।
সহসা হে পিতঃ! একি হায়! হায়!
সপ্তমী তিথিতে আবাহনী মায়,
চিরনিদ্রাগত হলে মাতৃক্রোড়ে
অকালে বিজয়া ঘোর।

(৩)

প্রণমিয়ে দেব! নিবেদি চরণে,
কেন আজি হায় করিছ প্রয়াণ?
বিজয়া দশমী, আজো রহে দূরে,
কেন যাও তবে কাঁদায়ে পরাণ?
বিশাল নভের দিবাকর সম,

তুমি যে দেশের প্রভা অনুপম,
তোমার অভাবে হবে যে আঁধার,
কে আলো জ্বালিবে হায়!

(৪)

কর্ম্মযোগী তুমি, সাধিতে সতত,
আপন সাধনা নীরবে গোপনে,
সুযশ-সুনামে, না ছিলে প্রয়াসী,
ধ্রুব লক্ষ্য ছিল শুধু ঊর্দ্ধ পানে।
ছিলনাক জানা মহেশ মতন,
কেবা তব পর কে তব আপন,
নিরখি হরষে সম স্নেহ চক্ষে
তুষিতে যে সবাকায়।

(৫)

সুখ, দুখ যত, সঁপি মার পায়,
হাসিয়া খেলিয়া অম্লান বদনে
সংসারসংগ্রামে, পশিয়া মানব
রাখি প্রাণ মন ধর্ম্মপথ-পানে—
কিরূপে জগতে লভে থাকে জয়,
দেখায়ে তুমি তা সারা বিশ্বময়,
মায়ের নিদেশ সমাপন করি
যাইছ কি মার ক্রোড়ে?

(৬)

তব মুখপানে, কাতরে চাহিয়া,
হের পিতঃ! কত রহে ভাইবোন,
তোমারে হারালে, কার কাছে তারা,
লভিবে আদর স্নেহ অতুলন?
তব বিদায়ের বিষাদ-তিমিরে,
আপনা আবরি অবনত শিরে,
কাঁদে যে ধরণী করি হাহাকার
ভাসে যে নয়নলোরে।

(৭)

সহসা একি গো! হেরিনু বিস্ময়ে,
নিজে ধর্ম্মরাজে পুষ্পরথ-পরে,
বাজাইয়া শাঁখ, যত দেববালা
আবাহনে দেবে জয়মালা করে।
মধুর দুন্দুভি বাজে সুখায়নে,
যত দেবগণ পুষ্প-বরষণে,
করে হে পুলকে প্রেম-আবাহন
ধন্য হে জীবন তব!

(৮)

বুঝিনু হে পিতঃ! দেবতাই তুমি,
তাই দেবপুরে করিছ প্রয়াণ,
পাপে তাপে ভরা এই বসুমতী
না হয় কখনও তব যোগ্য স্থান,
কাঁদিব না আর যাও অমরায়,
বিশ্বমাতা তোমা ডাকে আয় আয়,
লভ মার কোলে চির সুখ-শান্তি,
ভুলিব বেদনা সব।

(৯)

অবশেষে পিতঃ! মিনতি চরণে,
ভুলোনা হে দেব! তাপিত সন্তানে,
জীবনের মোর অন্তিম শয্যায়,
কোলে তুলে নিও বাথিতা বালায়।
"শিশির"-রচয়িত্রী।

২৯।০ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং অ্যাণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 569. January, 1911.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ।
৫৬৯ সংখ্যা। { পৌষ, ১৩১৭। জানুয়ারি, ১৯১১। } ৯ম কল্প।
৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল-সমিতি—এবার কংগ্রেসের সময় এলাহাবাদে শ্রীমতী সরলাদেবীর তত্ত্বাবধানে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের এক অধিবেশন হয়। জাঁজিরার বেগম সাহেবা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রতাপগড়ের রাণী, ভূপালের বেগম, ভিজিয়ানাগ্রামের রাণী, কর্পূরতলার রাণী, কাম্বের বেগম, প্রভৃতি প্রায় সাত শত মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী এই সভায় বলেন যে, মানবজাতির উন্নতির জন্য নারীগণ চেষ্টা করিবেন। এই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলই তাহার কেন্দ্রস্থল। আরও অনেকগুলি মহিলা এই সভায় বক্তৃতা করেন।

নারী সমিতি—বিগত ২৮এ ডিসেম্বর এলাহাবাদে নারী-সমিতির এক অধিবেশন হয়। এই সভায় ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাণী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে ইংরাজিতে বক্তৃতা করেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ ও কংগ্রেস—কংগ্রেসের পক্ষ হইতে অভিনন্দন সহ সার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণপ্রমুখ কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গের ডেপুটেসন গ্রহণ করিতে লর্ড হার্ডিঞ্জ সম্মত হইয়াছেন। ৫ই জানুয়ারী বড়লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়কে অভিনন্দন দেওয়া হইবে। লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়কে যে অভিনন্দন দেওয়া হইবে তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

আমরা আপনার নিকট গভীর রাজভক্তি লইয়া উপস্থিত হইতেছি, ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে আপনি যাহা করিবেন সে বিষয়ে সহকারিতা করিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

১৮৫৮ সালের ঘোষণাপত্রের জুবিলি

উপলক্ষে পরলোকগত সম্রাট্ যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহার মর্ম্ম অনুসারে ব্যবস্থাপক সভা সম্প্রসারণ করিয়া ভারতবাসীদিগকে দেশের কার্য্য করিবার অধিকতর সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, ভারতবাসিগণকে বড় লাটের ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রি-সভার সভ্য মনোনীত করা হইয়াছে এবং ভারত-সচিবের কমিটির মেম্বর করা হইয়াছে। ইহাতে প্রকাশ পায় যে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবাসিগণকে উচ্চপদে নিযুক্ত করা রাজার অভিপ্রায়, ইহাতে গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি হইবে। সম্প্রতি আমরা জনসাধারণের উন্নতিকল্পে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ আবশ্যকতা হইয়াছে। নিম্ন শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার জন্য অধিকতর অর্থব্যয় করা প্রয়োজন। নিম্ন শিক্ষার দ্বারা কৃষিজীবী ও অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর লোকের উপকার হইবে, শিক্ষার অভাবে তাহারা দুর্ভিক্ষ ও রোগের হাত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে জানে না। গ্রামের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য এক কমিশন নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক্ হওয়া প্রয়োজন; তাহা হইলে বিচার নিরপেক্ষভাবে চলিবে। কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি যথা-সময়ে আপনার নিকট প্রেরিত হইবে; ইহাতে সমগ্র ভারতের ও প্রাদেশিক অনেক অভাব অভিযোগের কথা আছে, আশা করি, আপনি এ সকল বিষয়ে সুবিবেচনা করিবেন। আপনাকে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি, আপনার শাসনসময়ে দেশে শান্তি উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ হউক। আপনি শান্তিসংস্থাপক রাজা এডওয়ার্ডের বিশ্বস্ত বন্ধু, তাঁহার মৃত্যুতে আমরা চিরদিনই দুঃখ প্রকাশ করিব।

রাজ্যাভিষেক-দরবার—দিল্লীতে রাজ্যাভিষেক-দরবারের সময় কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান হইবে না এইরূপ শুনা যাইতেছে। রাজা ও রাণী আপনারাই রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করিবেন। লণ্ডন হইতে এই অনুষ্ঠানের জন্য রাজদণ্ড ও রাজমুকুট প্রভৃতি আনা হইবে। ভারতে এই মহোৎসব দেখিবার জন্য সকলে উৎসুক।

ভারতে শান্তি ও ভারত-সচিবের মত—ভারত-সচিব লর্ড ক্রু এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ভারতের অবস্থা আশা-প্রদ। তথায় অধিকতর শান্তিস্থাপনের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। রাজা ও রাণীর ভারত-আগমনে আরও অধিকতর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ত্রিবাঙ্কুরে বিবাহ-আইন—ত্রিবাঙ্কুরে এক স্ত্রীর বহু স্বামী থাকা এতদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এই প্রথার প্রচলন বন্ধ হইয়া নূতন বিবাহ আইন প্রচলিত হইয়াছে। তাহাতে এক স্ত্রীর দুই স্বামী গ্রহণ আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

পুরুষজাতি সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রচলিত হওয়া উচিত।

আশ্চর্য্য অস্ত্রচিকিৎসা—সম্প্রতি লণ্ডনের শিশু হাঁসপাতালে এক বালকের আশ্চর্য্য অস্ত্র-চিংকিৎসা হইয়াছে। বালকটীর বয়স যখন আঠার মাস, তখন পড়িয়া গিয়া মাথায় অত্যন্ত আঘাত লাগে; তাহাতে তাহার মাথার ডান দিকের হাড় বাড়িতে পারে নাই; সেখানে একটা মাংসপিণ্ডের মত হইয়াছিল। গত অক্টোবর মাসে বালকটী পুনরায় পড়িয়া যায়, তখন তাহাকে হাঁসপাতালে গ্রহণ করা হয়। চিকিৎসকগণ দেখিলেন যে, ঐ মাংসপিণ্ডের মধ্যে জলীয় পদার্থ জমা হইয়াছে, উহার চাপে মস্তিষ্ক বৃদ্ধি পাইতে পারিতেছে না। ডাক্তারগণ ঐ বর্দ্ধিত অংশ অস্ত্রপ্রয়োগে কাটিয়া ফেলিয়া মস্তিষ্কের ব্যাগ সেলাই করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে মাথার অনেকটা স্থান হাড় না থাকাতে ফাঁক হইয়া রহিল। তখন বালকের পা হইতে কতকটা হাড় চাঁছিয়া লইয়া মস্তকের হাড়ের সঙ্গে সেই শূন্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া হইল। অনেক দিন বালকটীর জীবন সংশয়াপন্ন ছিল। মস্তিষ্কের থলেটি, ভালরূপে সেলাই করা হয় নাই বলিয়া পুনরায় খুলিয়া ভাল করিয়া সেলাই করা হয়। ইহার পর বালক ক্রমেই সুস্থ হইতে লাগিল। এই ভাবে তিন ইঞ্চি স্থানে হাড় জন্মিল। বালকটী সুস্থ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। অস্ত্র-চিকিৎসার দিন দিনই উন্নতি হইতেছে। ইহা অতি আনন্দের বিষয়।

মিশরে খনিজ তৈল—মিশরে কেরোসিন তৈলের যে ক্ষেত্র বাহির হইয়াছে, তাহা প্রায় দুই শত মাইল স্থান ব্যাপিয়া আছে। ভূস্তরের নিম্ন হইতে যে তৈল উঠিতেছে, তাহা অতি উত্তম। এই ক্ষেত্রে পাঁচটী কূপ করিয়া তৈল উঠান হইতেছে। প্রত্যহ এই সকল কূপ হইতে সাতশত হাজার মন তৈল বাহির হইয়া থাকে। রুষের তৈল অপেক্ষা মিশরের এই তৈল কোন গুণে ন্যূন নহে। আমাদের মনে হয়, ইউরোপের ধনিগণ শীঘ্র অর্থ ব্যয় করিয়া এই ব্যবসায় চালাইবেন।

স্ত্রীলোকের কাজ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এ পর্য্যন্ত আমি স্ত্রীলোকেরা সচরাচর নিজ গৃহে ও পরিবারের মধ্যে কিরূপে কাজ করিতে পারেন, তাহা দেখাইয়াছি। হয়ত ইহার অনেক নিয়োগ নারীদের

পক্ষে অতি সামান্য, তুচ্ছ ও বিরক্তিজনক বোধ হইবে, হয়ত ভদ্রবালারা উহা হেয় কাজ ভাবিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, প্রতিদিন মনোযোগপূর্ব্বক এই সকল সামান্য কর্ত্তব্য পালনের দ্বারাই অনেক মহচ্চরিত্র লোকের উৎপত্তি হইয়াছে; আর উহাই ভবিষ্যতে আরো কত মহা-জীবন নির্ম্মাণের প্রধান হেতু হইবে। আমাদের সম্মুখ দিয়া এমন কত পূজনীয়া জননী চলিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের অবস্থান সংসারে সূর্য্যকিরণের ন্যায় সর্ব্ব স্থান আলোকময় করিয়া রাখিয়াছিল, এবং যাঁহাদের স্মৃতি বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের সন্তানসকলের অন্তরে দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা যে কোন অসাধারণ গুণের বলে বা অলৌকিক সাধনার দ্বারা ওরূপ দেবীর পদ পাইয়াছিলেন, তাহা নহে। কেবল একাগ্রমনে, সযত্নে ও সানন্দচিত্তে কর্ত্তব্যপালন করিয়া—রোগীর সেবা করিয়া, তৃষিতকে জলদান করিয়া, ব্যথিতকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া, দুঃখীর চক্ষের জল মুছাইয়া, পরিবারের ভাত রাঁধিয়া, সন্তানদিগকে ক-খ শিখাইয়াই—তাঁহারা সংসারে মান্য ও পূজা পাইয়াছিলেন।

কার্য্যশেষে বিশ্রাম লাভ করিবার সময় আমরা কোন্ অস্ত্রের দ্বারা কর্ম্ম সাধন করিয়াছি, তাহা আমাদের স্মরণ করিবার প্রয়োজন নাই। উহা কলমই হউক, ছুঁচই হউক, আর ঝাঁটাই হউক—উহা দ্বারা যদি আমরা নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট নিয়োগে যথেষ্ট কার্য্য সাধন করিয়া থাকি, তাহা হইলে পরম পিতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। কেবল ঐ সকল কর্ত্তব্য সাধনের পথ দিয়াই আমরা মহৎ লোকদিগের কাছে যাইবার আশা করিতে পারি। স্ত্রীলোকের গৃহকর্ম্ম লোকে তুচ্ছ বলিয়া ভাবিলেও উহা সামান্য কার্য্য নহে। অন্যান্য প্রকাশ্য কার্য্যের ন্যায় এই গুপ্ত কর্ত্তব্যও নিয়ম মত পালন করিতে আমাদের অনেক বুদ্ধি, জ্ঞান, শিক্ষা, সাহস, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার প্রয়োজন। উহাতে প্রচুর সুখ-শান্তি, আনন্দ-উল্লাস নিহিত আছে। এ সংসারে প্রকৃতরূপে চলিতে জানিলে নিজ নিজ গৃহেই আমরা স্বর্গের সাক্ষাৎ পাই, উন্নত মানবচরিত্রে আমরা কাল্পনিক দেবতার চিত্র দেখি, এবং পিতা মাতা ও স্বামী সন্তানের মুখে ঈশ্বরের ছায়া দেখিতে পাই।

লোকে কথায় বলে 'স্ত্রীলোক পুরুষকে যেরূপ গঠন করে, তাহারা তেমনি হয়।' এ কথাটি সত্য কথা। আমাদের এই বদ্ধ জীবনেও আমরা সচরাচর পুরুষের মনের উপর স্ত্রীলোকের মহাপ্রভাব দেখিয়া থাকি। কত স্নেহময়ী মার উপদেশে অসৎ ছেলেরা সৎ হয়, কত গুণবতী স্ত্রীর অনুনয়ে অধার্ম্মিক স্বামীরা ধর্ম্মপথে আসে। কত পবিত্র মাতার দৃষ্টান্তে সৎ-পথভ্রষ্ট সন্তান বিশুদ্ধ হয়, কত আনন্দময়ী

ভগিনীকে দেখিয়া দুষ্ট ভ্রাতা শিষ্ট হয়। আবার কত পবিত্রা, সতী শিক্ষিতা স্ত্রীর সহবাসে পাষণ্ড পতি কোমল হয়। এমন মহৎ কার্য্য যে স্ত্রীজীবনের উদ্দেশ্য, এমন উচ্চ পদে যে নারী অধিষ্ঠিত, সে রমণীজাতির কাজ কি সামান্য? আমাদের জীবন কি অকিঞ্চিৎকর? না, না, তাহা কখনই নহে। ঈশ্বর আসিয়িক, ইউরোপীয়, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বাঙ্গালী, ইংরাজ, সকল স্ত্রীলোককেই এক ছাঁচে গড়িয়াছেন, এক শোণিতে পূরিয়াছেন; তবে এতদিন আমরা কেবল নির্দ্দিষ্ট কাজের অভাবে এরূপ ভিন্ন বলিয়া পরিচিত রহিয়াছি। কিন্তু আর না; ভগিনী সব! এস, নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া রমণী-নামের সার্থকতা সাধন করি।

থাকিতে বাসনা যদি আনন্দের মাঝে,
সতত ঘুরগো তবে কর্ত্তব্যের কাজে।
এ ব্যস্ত সংসার ছেড়ে বিরলে নিবাস—
নহে সে শান্তিতে কভু মানবের আশ।
নদীর গতির ন্যায় জীবন চঞ্চল,
অথচ চাহে না উহা ঝটিকার বল।
ধীর কিন্তু দ্রুতপদে সাগরে নামিবে—
জগতের কার্য্যশেষে অনন্তে মিশিবে।
ভালবাসা, পরিচর্য্যা, পরিশ্রমবলে,
উর্দ্ধেতে উঠিবে উহা থেকে ধরাতলে।
অসীম কাজের মাঝে স্বর্গপানে চাবে,
সেই সে জীবন সত্য এ বিপুল ভবে।

ডাক টিকিট।

ডাক টিকিট প্রবাসীর পক্ষে বহু উপকারী ও প্রয়োজনীয়। কি ধনী, কি দরিদ্র সকলের পক্ষেই সমান। জীবনের সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে ইহাও প্রধান বলিয়া গণনা করা যায়। সামান্য আয় সত্ত্বেও লোকে ডাক টিকিটের জন্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অতএব ইহার ইতিহাস শোনা উচিত। একটী সামান্য ঘটনা দ্বারা জগতে ইহার প্রচলন আরম্ভ হয়।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১০শে জানুয়ারী হইতে লণ্ডনে, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণিতে ইহার প্রচার আরম্ভ হয়। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে উত্তর ইংলণ্ডের এক পান্থনিবাসে একটী যুবতী চিন্তাপূর্ণ হৃদয়ে উক্ত আবাসদ্বারে যেন কাহার অপেক্ষায় আসা যাওয়া করিতেছিল। উহার স্নেহপূর্ণ নয়ন দুটী সতৃষ্ণভাবে কাহার পথ চাহিয়াছিল।

অপেক্ষিত সময় অতি দীর্ঘ হয়, মানুষ পলে পলে তাহার গুরুত্ব অনুভব করে। যুবতীর ভ্রাতা বহুদিন হইল প্রবাসে গিয়াছে, আবাল্যসঞ্চিত সৌভ্রাত্রস্নেহে অন্তরের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ পরিপূর্ণ, তাই আজ ব্যাকুলহৃদয়ে বিদেশস্থিত সোদরের কুশলবার্ত্তাবাহী লিপিখণ্ডের আশায় ঘর

বাহির করিতেছে। ইত্যবসরে দ্বারে কে আঘাত করিল। যুবতী প্রার্থিত বস্তুর আশায় ছুটিয়া বাহির হইল। সম্মুখে দেখে ডাকপিয়ন পত্রহস্তে দণ্ডায়মান। যুবতী পুলকিত চিত্তে পত্রখানি চাহিল।

ইহার মাশুল এক শিলিং দিতে হইবে, ডাকপিয়ন কহিল।

যুবতীর আনন্দবিস্ফারিত নেত্র, উৎফুল্ল হৃদয় গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। হায়! আজ ত এক শিলিং নাই, তবে আর দাদার পত্র রাখিতে পারিলাম না নীরবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া চলিল।

ঘটনাস্থলে উক্ত পান্থনিবাসে আর একটী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নাম রোলণ্ড হিল। তিনি এক শিলিং মাশুল দিয়া ডাকপিয়নের হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া যুবতীকে দিলেন। যুবতী বিনম্রহৃদয়ে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া পত্রখানি ওলট পালট করিয়া বারম্বার দেখিয়া কহিল, ইহার বাহিরের অঙ্কিত চিহ্নেই আমার জ্ঞাতব্য বিষয় সকল জানিয়া লইলাম। ভিতরে আর কিছুই লেখা হয় নাই, পাছে মাশুল বেশী লাগে।"

রোলণ্ড হিল নিজ গন্তব্য স্থানে যাইতে যাইতে ভাবিলেন, এ যুক্তি মন্দ নয়, এরূপ প্রতারণায় পাপ নাই। আচ্ছা, তবে যে দেশে ব্যবসায় বাণিজ্য এত অধিক এবং যে দেশের লোকেরা নানা কার্য্যোপলক্ষে আত্মীয় স্বজনের স্নেহ মমতার বন্ধন কাটাইয়া প্রবাসে যায়, তথায় যদি এই উপায়ে পত্রের মাশুল কমাইয়া দেওয়া যায়, তবে লোকের কত উপকার হয়। এবং সরকারকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না।

তাঁহার এ উদ্দেশ্য সফল হইল। উক্ত চিত্রাঙ্কনানুযায়ী পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প গবর্ণমেণ্টের আইনমত উল্লিখিত সময় হইতে প্রচলিত হইল। সমুদয় বৃটীশ আইল্যাণ্ডে এক পেনি মাশুলে কথিত পরিমাণের পত্র যাতায়াত করিতে লাগিল।

এই শুভ সংবাদ অচিরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং দশ বৎসরের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের পোষ্ট্যাল বিভাগের আয় পাঁচগুণ বৃদ্ধি হইল। রোলাণ্ড হিল ইংলণ্ডের পোষ্টমাষ্টার-জেনারেলের সেক্রেটারী হইলেন।

এই ক্ষমতা ও কৌশল পরে ক্রমে ক্রমে সমুদায় সভ্য দেশে গৃহীত হইল।

শ্রী "মনোজবা"-রচয়িত্রী।

অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার উন্নতি সাধনের উপায়।

অতএব দেখা যায় যে, পুরুষ শিক্ষকাপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীর অধিক প্রয়োজন। কেবল অবরোধপ্রথা আছে বলিয়া যে শিক্ষয়িত্রী অধিক বাঞ্ছনীয়, এরূপ

নহে। বোধ হয় রমণীদের অভাব ও প্রকৃতি রমণীরা ভালরূপে বুঝিতে পারেন ও অন্যান্য বিষয়েও অনেক সুবিধা হয়। এরূপ বিদ্যালয় আবশ্যক, যেখানে পুরুষ শিক্ষকের নাম গন্ধও নাই ও বিদ্যালয়ে বোর্ডিং থাকাও প্রয়োজনীয়। ঐরূপ বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী ও তত্বাবধারিকা থাকিলে অন্তঃপুরাবরুদ্ধা রমণীদেরও তথায় পাঠ করা ও অবস্থান করা সম্ভব হইতে পারে। এরূপ বিদ্যালয়ের জন্য সচ্চরিত্রা সুশিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা আবশ্যক ও তাঁহাদিগকে অল্প বেতনের পরিবর্ত্তে অধিক বেতন দিয়াও নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। ঐরূপ কতকগুলি উচ্চশিক্ষাপ্রদ বিদ্যালয় থাকিবে ও তথায় বিজ্ঞানাদি উচ্চ শিক্ষাভিলাষিণী রমণীগণ অধিক বেতন দিয়া পাঠ করিবেন ও যাঁহারা অধিক বেতন দিয়া পড়িতে অসমর্থা, তাঁহারা বুদ্ধিমতী হইলে ও বৃত্তি পাইলে অবস্থানুসারে বেতন না দিয়া বা অল্প বেতন দিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। ঐরূপ বিদ্যালয় ব্যতীত সাধারণ শিক্ষা সুলভ ও সামান্য ভাবে বিতরণের জন্য কতকগুলি বিদ্যালয় থাকা আবশ্যক। কিন্তু ঐরূপ বিদ্যালয় দ্বারা অধিকসংখ্যক অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, এরূপ বোধ হয় না। ব্রাহ্ম বালিকা ও বেথুন ইত্যাদি দুই একটী রমণীবিদ্যালয়ে কতকগুলি স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী থাকিলে চলিবে না আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের সংখ্যা যেমন অধিক, তেমনি সর্ব্বস্থানেই সুশিক্ষয়িত্রী ও বিদ্যালয় থাকা প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইহাতেও অনেক অন্তঃপুরবাসিনী শিক্ষালাভে বঞ্চিতা হইবেন। তজ্জন্যই ভাল ভাল সচ্চরিত্রা শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক—প্রত্যেকের শিক্ষার জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী দুর্লভ ও বহুব্যয়সাপেক্ষ। ভাল শিক্ষয়িত্রী পাইলে কতকগুলি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া তাঁহাদের ও অন্যের অন্তঃপুরমহিলাগণকে শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করিতে পারেন। যদি তাহাতেও ব্যয় সঙ্কুলান না হয়, তবে দেশস্থ অনেক ধনকুবের আছেন, তাঁহারা এ বিষয় মনোযোগী হইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। সকল বিষয়ে যথাসাধ্য আত্মনির্ভর করা ভাল, সহসা রাজপুরুষদিগের সাহায্য ভিক্ষা করা ভাল বোধ না, তবে তাঁহারা সাহায্য করেন ভালই। কিন্তু আমার বোধ হয়, অন্যের সাহায্য ব্যতীত দেশীয় ধনিগণ যে অর্থ ব্যসনাদিতে ব্যয় করেন, উহার কিয়দংশ অন্তঃপুর মহিলাদের স্ত্রীশিক্ষায় ব্যয়িত হইলে সমূহ কল্যাণ হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই—স্ত্রীশিক্ষা বিতরণের জন্য কাহারা শিক্ষয়িত্রী হইবেন? এ ব্রতে হিন্দু মহিলারা যোগ দিবেন না—দিলে ত লক্ষ লক্ষ বিধবা শোকের ডালি মস্তকে বহন করিয়া জীবন কাটাইতেছেন, তাঁহারা নিজ ভগ্নীদের উপকার করিতে যত্নবতী হইলে ভাবনা কি? কিন্তু তাঁহারা অগ্রসর হইবেন না। তবে যদি ব্রাহ্ম মহিলাদিগকে

প্রথমতঃ শিক্ষা দ্বারা উপযুক্তা করিয়া এই সর্ব্বজনহিতব্রতে নিয়োজিত করিতে পারা যায়, তবে সমাজের সমূহ মঙ্গল অচিরাৎ সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। এইরূপে কোনও প্রকারে মহিলারা একবার জ্ঞানের আস্বাদন পাইলে নিশ্চেষ্টা থাকিবেন না।

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা বিতরণের জন্য এদেশে যে সকল খৃষ্টীয়া মিশনরী নারী আছেন, তাঁহারা অনেক উপকার করিতেছেন স্বীকার করি। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের নিকট হইতে অধিক কিছু আশা করা যায় না।

আধুনিক ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত, ভবিষ্যতের আশা ভরসার স্থল দেশীয় যুবকমণ্ডলীর প্রশংসনীয় চেষ্টায় অনেক স্থানে স্ত্রীশিক্ষা-বিতরণের জন্য সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। ইঁহারা পরীক্ষা গ্রহণান্তর পুরস্কার প্রদান ও বৃত্তি স্থাপন দ্বারা ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অন্তঃপুর বাসিনীদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় ভাব ও পুরস্কার লাভের ইচ্ছা প্রবল করিয়া দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করিতেছেন। যাঁহারা বিদ্যালয়ে যাইবেন না, তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে পরীক্ষিতা হইতে চাহেন ও নিজের নিজের নাম ধামাদি ও তত্ত্বাবধায়কের বা অভিভাবকের নামাদি সমিতির নিকট লিখিয়া পাঠান। সমিতি হইতে রমণীদিগের নিকট প্রশ্ন প্রেরিত হয় ও পরীক্ষানন্তর বৃত্তি বা পুরস্কার যোগ্যতানুসারে প্রদত্ত হয়। এ সকল ব্যতীত আরও একটী উপায় আছে। আজ কাল ভদ্রসমাজে বিবাহে "জামাতা ঠাকুর"কে অনেক অর্থ দিতে হয়, কিন্তু অর্থের পরিবর্ত্তে জামাই বাবুরা যদি বালিকাদের শিক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় মনে করেন ও ঐ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন তবে কন্যাকর্ত্তা বা বালিকাদের অভিভাবকেরা বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেন, ইহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। লোকে অন্য কারণে অন্তঃপুরবাসিনী-দিগকে শিক্ষা দিতে না চাহিলেও অন্ততঃ বিবাহ দেওয়া দুর্ঘট ভাবিয়াও তাঁহাদের শিক্ষার বিষয় অমনোযোগী থাকিতে পারিবেন না।

অঞ্জলি।

(১)

বিশ্বনাথ!
অনন্তের এককোণে
আমি ক্ষুদ্র রেণুকণা,
কি বুঝিব মূঢ় আমি
তোমার করুণাকণা।

(২)

তোমার নিখিল বিশ্ব

সৃষ্টির কৌশল তব,
তাহাতে তোমার স্নেহ
হেরি নিত্য অভিনব।

(৩)

তোমার মহিমা-বলে
প্রভাতে তরুণ রবি,
সুনীল গগনে হাসে
ছড়া'য়ে কনক ছবি।

(৪)

নিশীথে,কিরণ ঢালে
কাহার আদেশে শশী,
সে আলোকে মাখা যেন
তোমার করুণারাশি।

(৫)

তারাগুলি ফুটে উঠে
অনন্ত গগন গায়,
ছড়ায়ে কিরণকণা
তোমার মহিমা গায়।

(৬)

কোকিলের কুহুস্বরে
পাপিয়ার মৃদু গানে,
তোমার স্নেহের কথা
নীরবে জাগায় প্রাণে।

(৭)

তটিনীর ভরা বুকে
কুলু কুলু কুলু তান;
তারি মাঝে শুনা যায়
তোমার মহিমা-গান।

(৮)

বসন্ত হেমন্ত আদি
ছয় ঋতু কত বার,
তোমার করুণা বলে
আসে যায় বার বার।

(৯)

প্রকৃতির ভরা বুকে
দিয়াছ মাধুরী কত!
শ্যামল কুন্তল তার
সাজায়েছ ফুলে শত।

(১০)

অবোধ সন্তান মোরা
তোমার মহিমা-বলে,
কখনও হরষে হাসি,
কভু ভাসি আঁখিজলে।

(১১)

তুমি আছ তাই আছি
তুমি ছাড়া আমি নাই,
যখন ভাঙ্গিবে খেলা
চরণেতে দিবে ঠাঁই।

(১২)

তুলিয়াছি এই প্রভু!
ভকতি কুসুমরাজি,
ঢালিব বলিয়া নাথ!
তোমার চরণে আজি।

(১৩)

অধম সন্তান ব'লে
চরণের ধূলিকণা
অন্তিমে শিরেতে দিতে
যেন প্রভু ভুলিওনা।

শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।
রাজসাহী।

প্রাচীন আর্য্য নারীদিগের সম্মান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পিতা হইতে দেহ লাভ হয়, আচার্য্য বা অধ্যাপক হইতে সেই দেহে জ্ঞান লাভ হয়; অতএব আচার্য্য বা অধ্যাপক পিতৃতুল্য বলিয়া তৎপত্নীও মাতৃতুল্যা। যাঁহার রাজ্যে বাস করা যায়, সেই রাজা প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করেন। রাজ্যের সকল পদার্থই রাজার; ধরিতে গেলে রাজার স্নেহে ও রাজার অন্নেই প্রতিপালিত হওয়া যায়, অতএব রাজা পিতৃতুল্য বলিয়া তৎপত্নীও মাতৃতুল্যা। মাতা যেমন খাদ্য দান করিয়া সন্তানকে প্রতিপালন করেন, তেমনি যে স্ত্রীলোক অন্নদান করিয়া প্রাণ বাঁচান, তিনিও মাতৃতুল্যা। ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায় করেন এবং ধর্ম্মোপদেশ দান করেন বলিয়া গুরু এবং পুত্রের ন্যায় সকল জাতিকে স্নেহ করেন বলিয়া পিতা, এই জন্য ব্রাহ্মণপত্নীগণও মাতৃতুল্যা পূজনীয়া। যাহাকে দারা হইতে ভিন্নরূপে দেখিতে হয়, এরূপ স্ত্রী অর্থাৎ পরপত্নীও মাতৃতুল্যা। যাহাদিগকে স্নেহের চক্ষুতে দেখিতে হয় এবং ভালবাসিয়া মা বলিয়া ডাকা যায়, তাহারাও মাতৃতুল্যা। গাভী পশুজাতি হইলেও তাহাকে এক প্রকার মাতা বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। যেমন মাতৃস্তন্যে প্রতিপালিত হওয়া যায়, তেমনি শিশুকালে এবং তৎপরেও গাভীর দুগ্ধে প্রতিপালিত হওয়া যায় বলিয়া গাভীও এক প্রকার মাতা। ধরিত্রীকেও আমাদের শাস্ত্রে এক প্রকার মাতা বলে। মাতা যেমন ক্রোড়স্থিত শিশুর সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করেন, তেমনি ধরিত্রী দেবীর (ক্রোড়ে) উপরে থাকিয়া আমরা যে যে দোষ করি, তাহা তিনি সহ্য করেন, এই জন্য ধরিত্রীর আর একটী নাম সর্ব্বংসহা। যেমন মাতার বক্ষঃস্থিত স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া আমরা শিশুকালে প্রতিপালিত হই, তেমনি পৃথিবীর উপরে (বক্ষে) উৎপন্ন শস্যাদি ভক্ষণে আমরা প্রতিপালিত হই, এ কারণেও পৃথ্বী মাতৃতুল্যা। জননীতে পৃথিবীর ধর্ম্ম আছে বলিয়া সংহিতাকার মনু, মাতাকেও পৃথিবীর মূর্ত্তিবিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উল্লিখিত প্রকারে মাতৃধর্ম্ম আছে বলিয়া আমাদের পুরাণশাস্ত্রসমূহের কোন কোন খানিতে সপ্ত মাতা, কোন কোন খানিতে নব মাতা ও কোন কোন খানিতে ষোড়শ মাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

আদৌ মাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজ-
পত্নীকা।
গাবো ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ
স্মৃতাঃ॥
পদ্মপুরাণম্।

অনুবাদ। জননী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী,

রাজপত্নী, গাভী, ধাত্রী ও পৃথিবী এই সাত জন মাতা বলিয়া কথিতা হন।

জননী গুরুপত্নী চ জ্যেষ্ঠসোদরপত্নীকা।
শ্বশ্রূর্জ্যেষ্ঠা সোদরা চ পিতৃব্যস্ত্রীচ মাতুলী।
মাতুঃ পিতুঃ স্বসা চৈব নবেমা মাতরঃ
স্মৃতাঃ।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্।

অনুবাদ। জননী, গুরুপত্নী, জ্যেষ্ঠ-সহোদর-পত্নী, শাশুড়ী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পিতৃব্যস্ত্রী, মাতুলানী, মাতৃষ্বসা ও পিতৃষ্বসা ইহাঁরা নয়জন মাতা বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকেন।

স্তনদাত্রী গর্ভধাত্রী ভক্ষ্যদাত্রী গুরুপ্রিয়া।
অভীষ্টদেবপত্নী চ পিতুঃ পত্নী চ কন্যকা॥
সগর্ভজা যা ভগিনী পুত্রপত্নী প্রিয়াপ্রসূঃ।
মাতুর্মাতা পিতুর্মাতা সোদরস্ত প্রিয়া তথা।
মাতুঃ পিতুশ্চ ভগিনী মাতুলানী তথৈবচ॥
জনানাং বেদবিহিতা মাতরঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

অনুবাদ। স্তনদাত্রী, গর্ভধারিণী, ভক্ষ্য-দাত্রী, আচার্য্যাণী, অভীষ্টদেবপত্নী (মন্ত্রদাতা গুরুর পত্নী), বিমাতা, বৈমাত্রেয়া ভগিনী, সহোদরা ভগিনী, পুত্রবধু, কন্যা, মাতামহী, পিতামহী, সহোদর-ভ্রাতৃবধু, মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা ও মাতুলানী ইহাঁরা ষোলজন মনুষ্যদিগের বেদবিহিতা মাতা বলিয়া স্মৃতা হইয়া থাকেন।

প্রাচীনকালে আর্য্যদিগের নিকটে যেমন পূজনীয়া মহিলামাত্রই মাতার ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হইতেন, তেমনি স্নেহাস্পদ আত্মীয়া স্ত্রীলোকমাত্রই কন্যার ন্যায় স্নেহ ও আদর লাভ করিতেন। কন্যার সহিত বিশেষ এই যে, কন্যাকে বিবাহের উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত পালন করিয়া উত্তম পাত্রসাৎ করিলেই হইত, আর কন্যাতুল্য স্নেহভাজন পুত্রবধূ প্রভৃতিকে চিরকাল সস্নেহে পালন ও সৎ-শিক্ষা দান দ্বারা সমাদর করিতে হইত।

গৃহদীপ্ত বা শোভান্বিত করে বলিয়া প্রত্যেক গৃহে কন্যা এক অতুলনীয় স্বর্গীয় পদার্থ। কন্যাগণ মাতাপিতার আনন্দবর্দ্ধন করেন বলিয়া ইঁহাদিগকে নন্দিনী কহে। মাতা পিতা হইতে পুত্র ও কন্যা উভয়েই জন্মলাভ করে। এই জন্য শাস্ত্রানুসারে পুত্রকে যেমন পালন ও শিক্ষাদান করিতে হয়, তেমনি কন্যাকেও পালন ও শিক্ষাদান করা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, পূর্ণ সাত বৎসর হইতে দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার কাল। কিন্তু এই নিয়মটী অনিয়ত অর্থাৎ সর্ব্বত্র ঘটে না। যদি উপযুক্ত বর পাওয়া যায় তবে বিবাহকাল উপস্থিত না হইলেও কন্যার বিবাহ দিবে। পক্ষান্তরে উপযুক্ত পাত্রের অপেক্ষায় যদি কন্যার বিবাহের উপযুক্ত কাল অতিক্রম হইয়া যায়, তবে তাহাও বিশেষ দোষ বিবেচনা করিবে না। পণ গ্রহণ করিয়া অসৎ পাত্রে কন্যার বিবাহ দিলে, পিতা যেমন চিরকাল কন্যার কষ্টের কারণ হন, তেমনি লোকসমাজেও নিন্দিত ও প্রায়শ্চিত্তার্হ হন। পর লোকেও কন্যাবিক্রয়ীর

অশেষ যন্ত্রণাকর নরকভোগ হয় বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। যে বর বিদ্বান্, মহেশ্বরভক্ত, সুশীল, সঙ্গতিপন্ন, সদ্বংশজাত, বলবান্ ও দুশ্চিকিৎস্য-ব্যাধি-হীন, তাহারই সহিত উপযুক্ত বয়সে কন্যার বিবাহ দিয়া পিতার কর্ত্তব্য সুপালন করিবে।

যেমন শাস্ত্রানুসারে মাতা অনেক প্রকার, তেমনি কন্যাও অনেক প্রকার। ইঁহাদিগকে কোন প্রকারেই কন্যা অপেক্ষা অল্প স্নেহ করিবে না। নিম্নে যে কয়েক প্রকার কন্যার নাম দেওয়া যাইতেছে, ইহাদের প্রতি সর্ব্বদা সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিবে।

পুত্রী, কনিষ্ঠসোদর্য্যা, পুত্রভার্য্যা তথৈবচ।
কনিষ্ঠসোদরস্ত্রীচ শিষ্যা পুত্রবধূস্তথা॥
ভ্রাতুস্পুত্রী ভাগিনেয়ী নবমী শরণাগতা।
সুতা পর্য্যায়কাস্ত্বেতাঃ স্নেহশাসনভাজনম্॥
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্॥

অনুবাদ। দুহিতা, কনিষ্ঠা সহোদরা, পুত্রবধূ, কনিষ্ঠ সহোদর পত্নী, শিষ্যা, পুত্র-তুল্য স্নেহাস্পদ ভ্রাতৃপুত্র ও ভাগিনেয় প্রভৃতির স্ত্রী, ভ্রাতুস্পুত্রী, ভাগিনেয়ী ও শরণাগতা নারী, এই নয়জন কন্যামধ্যে গণ্যা। ইঁহাদিগকে স্নেহ ও শাসন করিবে।

মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে লিখিত আছে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রতুল্য, কারণ পিতৃ বিয়োগ হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই তাহাকে লালন পালন ও শিক্ষাদান করেন। অতএব কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রবধূর ন্যায় স্নেহ করিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতাও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে মাতার ন্যায় সম্মান করিবে। জ্যেষ্ঠা ভগিনীও মাতৃতুল্যা, কারণ কখন কখন এরূপ ঘটে যে শিশু ভ্রাতা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্তন পান করে।

এইরূপেই আর্য্যগণ পুরাকালে কোনও কোনও মহিলাকে মাতার ন্যায় সম্মান ও কোন কোন মহিলাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিয়া নারীজাতির প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রে আরও নির্দ্দেশ আছে, পরিবারস্থ পূজনীয়া স্ত্রীবর্গ, ভার্য্যা, কন্যা, কুলবধূগণ, ও পরিচারিকাগণ ইহাদিগের কর্ত্তৃক উত্ত্যক্ত হইলেও তাহা সহ্য করিবে। ইহা-দিগের সহিত কলহ করিয়া পরস্পরের সম্মান নষ্ট করিবে না। অথবা তিরস্কার করিয়াও মনে কষ্ট দিবে না। সদুপদেশ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের হিত ও প্রীতিসাধন করিবে।

প্রাচীন ভারতে গৃহিণীগণ গৃহস্থাশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গৃহস্থের শরীরার্দ্ধভাগিনী ও সহধর্ম্মচারিণীরূপে সম্মানিতা হইতেন। গৃহিণীর অধিষ্ঠাতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন গৃহধর্ম্ম রক্ষা হয় না বলিয়া শাস্ত্রকারগণ গৃহিণীকেই গৃহ বলেন। স্ত্রীপর্য্যায়বাচক শব্দ-গুলির ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেও গৃহস্থাশ্রমে গৃহিণীর উপযোগিত্ব ও সম্মানভাজনত্ব বুঝিতে পারা যায়। যিনি গৃহদোষ আবরণ করেন, তাঁহাকে স্ত্রী কহে (স্তৃ + কর্ত্তৃবাচ্য ড্ট্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্),

অর্থাৎ যে থাকাতে গৃহ, বিশৃঙ্খলতাদোষ পরিশূন্য হইয়া শোভমান হয় ; তাহাকে স্ত্রী কহে। যাহাকে মহ বা পূজা করিতে হয় তাহাকে মহিলা কহে। (মহ্+কর্ম্ম-বাচ্যে কিরণ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্) অর্থাৎ বসন ভূষণাদি প্রীতিকর বস্তু, প্রিয় ব্যবহার ও প্রিয় বচনে তুষ্ট করিতে হয় বলিয়া স্ত্রীদিগকে মহিলা কহে। বিধিক্রমে বিবাহিতা স্ত্রীর কয়েকটী পর্য্যায় শব্দের মধ্যে একটীর নাম দ্বিতীয়া। স্ত্রী না থাকিলে গৃহস্থের অন্য সহকারিস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া কেহ গৃহস্থধর্ম্ম প্রতি-পালন করিতে পারে না বলিয়া, গৃহস্থ ধর্ম্মে গৃহী নিজে প্রথম, পরে স্ত্রীই দ্বিতীয়া।

গৃহস্থ যদ্দ্বারা আদৃত হয়, তাহাকে দার কহে (দৃ+করণবাচ্য ঘঞ্)। কুলস্ত্রীর অন্য নাম কুলপালিকা। যিনি বংশের অকীর্ত্তিকর দোষসমূহকে ঘৃণা সহকারে পরিবর্জ্জন করিয়া কুল পালন করেন, তাহাকে কুলপালিকা কহে। পুত্রাদি-যুক্তা গৃহস্থিতা স্ত্রীকে পুরন্ধ্রী কহে। পুরন্ধ্রী (পুর+ধৃ+কর্ত্তৃবাচ্যে খ+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্) এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ এই যে পুর বা গৃহ যিনি ধারণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ যিনি থাকাতে গৃহস্থ ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়া থাকে। স্ত্রীবাচক অন্যান্য শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ অনুসন্ধান করিলেও প্রমাণ পাওয়া যাইবে, প্রকৃতভাবে গৃহ-লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করেন বলিয়া, পতির মনোরঞ্জন করেন বলিয়া, গৃহস্থের ধর্ম্ম কর্ম্মে সহকারিণী হন বলিয়া স্ত্রী অত্যন্ত সম্মানার্হা।

পুরাকালে ধর্ম্মাচরণে সহকারিণী করি-বার জন্য একমাত্র পত্নীই গ্রহনীয়া ছিল। যদিও কেহ একাধিক বিবাহ করিত, তাহারা যে নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত না তাহা নহে। প্রথম বিবাহের পত্নী ধর্ম্মপত্নী নামে এবং অবশিষ্ট পত্নীগণ কামপত্নী নামে সাধারণতঃ অভিহিতা হইতেন। নরপতিগণ যে স্ত্রীর সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত হইতেন, তাহাকে রাজ-মহিষী বা মহিষী বলা হইত, এবং তদ্ভিন্ন অন্য স্ত্রীদিগকে ভোগিনী বলা হইত। মহিষী শব্দের অর্থ মাহিষের বা অভিষিক্ত রাজার স্ত্রী, অথবা অভিষেক কালে রাজার সহিত যাহাকে মহ বা পূজা করা হয়।

ভূত না মানুষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপদের সূত্রপাত।

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। সুস্নিগ্ধ, সুবা-সিত সমীর প্রবাহে ও কনকশুভ্র সুধাময় সুধাকর-কিরণে সমস্ত পুরমণ্ডল গ্রামখানি ঝলসিতেছিল। শ্যামল দূর্ব্বাদলের শিরো-ভাগে পূর্ণচন্দ্রের রজত কিরণ সম্পাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুনিচয় মুক্তামালার

ন্যায় ঝলমল করিতেছিল। আবার আকাশের অপর প্রান্তে ঘনীভূত মেঘমালা সজ্জিত হইয়া একরূপ বিচিত্র চিত্র চিত্রিত করিয়া গগনখানিকে অপূর্ব্ব চিত্রপট করিয়া তুলিতেছিল। এমন সময় একজন হতভাগ্য রুগ্ন ব্যক্তি ভগ্ন পালঙ্কে শয়ন করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। এই ব্যক্তির বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসরের অধিক হইবে না, কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধি তাহাকে বার্দ্ধক্যদশায় লইয়া উপস্থিত করিয়াছে। শরীরে পুর্ব্বের রূপ লাবণ্যের চিহ্নমাত্র নাই। পূর্ব্বে একদিন এই ব্যক্তি সদাশয় এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া সকলের মাননীয় ও অগ্রগণ্য ছিলেন। কিন্তু এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মহৎ মহান্‌ মহাশক্তিমান ভগবানের লীলাক্ষেত্র। এ অনন্ত লীলা বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই। সেই মহৎ ব্যক্তি আজ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র, অতি হেয় ব্যক্তিরও হেলনীয়। যখন তাঁহার রূপ ছিল, গুণ ছিল, ধন ছিল, মান ছিল, গৌরব ছিল, বল ছিল, যৌবন ছিল, তখন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, ভাল বাসিত, কিন্তু আজ ইনি আপন অদৃষ্টদোষে চিররুগ্ন ও মহাদরিদ্র। তাঁহার সম্মুখে একটি রমণীরত্ন বসিয়াছিলেন, রমণী যুবতী ও তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। কিন্তু এই সুন্দরী রমণীর সুন্দর দেহ অনাহারে, অল্পাহারে ও দুশ্চিন্তায় কিঞ্চিৎ ম্লান অনুভূত হইতেছে। বসন্তপ্রকৃতির অঙ্গে সন্ধ্যাবরণের ন্যায় এই বরবর্ণিনী রমণীর সমস্ত দেহ ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে; এবং তৎকালে তাঁহার মলিন অঞ্চল ঝঞ্ঝালুণ্ঠিত লতাটীর ন্যায় ভূমে পড়িয়া লুটিতেছিল। বায়ুতাড়িত মেঘমালার ন্যায় নিবিড় কেশরাশি পৃষ্ঠে, গালে, চোখে, মুখে পতিত হইয়া দ্বিগুণ শোভা বৰ্দ্ধণ করিতেছিল, রমণীর নাম প্রতিধ্বনি। এই রুগ্ন ব্যক্তিই প্রতিধ্বনির স্বামী, নাম দেবদত্ত।

দেবদত্ত চক্ষু বুজিয়া শুইয়া ছিলেন, প্রতিধ্বনি নিকটে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস দিতেছিলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি ডাকিলেন "প্রতিধ্বনি! প্রতি!" প্রতিধ্বনি উত্তরে কহিলেন,—"ঘুমাও নাই? তবে এখন ঔষধটা খাও।"

"না, আর ঔষধ খাইব না" বলিয়া দেবদত্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, কহিলেন,—অনেক ঔষধ খাইলাম, কিছুতে কিছু হইল না, আর ঔষধ খাইব না, বাড়ীর বড় বড় ঘরগুলি বিক্রয় করিয়া, তোমার গহনাপত্র ও আর সমুদয় জিনিষ বিক্রয় করিয়া কেবল ঔষধই খাইলাম, কিন্তু আরোগ্যলাভ করিতে পারিলাম না। মরিতে বসিয়াছি, নিশ্চয়ই মরিব, তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু তোমার যে কি গতি হইবে, তাহা ভাবিলে সত্যই যেন আমাকে শত শত বৃশ্চিক দংশন করে।" রুগ্নের শুষ্ক গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

"ছি, আবার ঐ কথা, আবার ঐ চিন্তা; রোগ কি কারো হয় না? তুমি

যে স্বপ্নে ঔষধটা পেয়েছিলে. সেটাতে তুমি অনেক ভাল হয়েছ, জ্বরটাও কমেছে, কাসি তো নাই বল্লেই হয়, বলিয়া প্রতিধ্বনি স্বামীকে ঔষধ পান করাইলেন।

দেবদত্ত নিজের জীবনে হতাশ হইয়াছিলেন, অতএব স্ত্রীর কথায় কোন উত্তর দিলেন না। এই সময় হঠাৎ অল্প অল্প বৃষ্টি ও প্রবল ঝড় আরম্ভ হইল। সেই বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির ক্ষুদ্র কুটীরের দরজায় পুনঃ পুনঃ আঘাত হইতে লাগিল।

"কে রে?" বলিয়া প্রতিধ্বনি বাতি উকাইয়া দিলেন। বৃষ্টিপতনের সঙ্গে সঙ্গে "দোর খোল" "দোর খোল" শব্দ শ্রুত হওয়া গেল।

একি, এ যে পুরুষের কণ্ঠস্বর! তাহাও যেন আবার অনেকগুলি লোকের মনে হইল। প্রতিধ্বনির গৃহে দুইটা লোক শয়ন করিতেন, ঘটনাক্রমে তাঁহারাও আজ উপস্থিত ছিলেন না। প্রতিধ্বনি অত্যন্ত ভীতা হইলেন, দ্বার না খুলিয়াই বলিলেন "তোমরা কে? কি চাও?

শব্দ হইল, দ্বার খোল। প্রতিধ্বনি দ্বার খুলিলেন না। স্থির হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন ও মনে মনে মহেশ্বর মহেশ্বরী তারাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে ক্ষুদ্র দরজা ভাঙ্গিয়া সাত জন বলিষ্ঠ পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিল।

প্রতিধ্বনি ছিন্ন বস্ত্রে সমস্ত দেহ আচ্ছাদিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন কিঞ্চিৎ রুদ্ধস্বরে কহিলেন, "তোমরা কে? কিজন্য আসিয়াছ?" তাহারা কহিল,—আমরা চণ্ডদেবের চর, তোমাকে ধরিয়া লইতে আসিয়াছি—।

প্রতি—কেন?

আগন্তুকগণ কহিল, "তাঁহার হুকুম, জানতো তিনি কে, স্ব ইচ্ছায় যদি যাও তবে সুখী হইবে, নচেৎ জোরপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইব।

প্রতি—চণ্ডদেব সাধু বলিয়াই আমার বিশ্বাস ছিল, এখন দেখিতেছি সাধু ত নয়ই, পাপীরও—অধম।

"মুখ সাম্‌লে কথা বল" বলিয়া ঐ সাত ব্যক্তি গর্জ্জণ করিয়া উঠিল, বলিল "যদি যেতে মন হয় তবে চল্, না হয় আমাদের কাজ আমরা করি।"

প্রতিধ্বনির হৃদয়ে আগুন জ্বলিতেছিল, চক্ষে জল ঝরিতেছিল, তিনি নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। চণ্ডদেবের অনুচরেরা কহিলেন, দেখ ভাবিয়া দেখ, এমন সুখ এমন শান্তি আর পাবে না। ঐ রোগা বেটার কাছে থেকে চিরকাল কেবল না খেয়ে না দেয়ে কেঁদে কেঁদে কাটালে, এখন একবার সুখের চেষ্টা দেখ।

প্রতিধ্বনিও তাহাদের প্রস্তাবে উপস্থিত সম্মত হওয়া ব্যতীত আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলেন ও শুষ্ক হাস্যরেখায় সুন্দর অধরপল্লব রঞ্জিত করিয়া কহিলেন, হাঁ আমিও তাহাই ভাবিতেছি, আর এত কাঁদিতে পারি না, আর এত